সঞ্জীব কুমার ঘোষ

গণিত নিয়ে গল্প



শিশু ও কিশোরদের গল্প সংকলন

গণিত নিয়ে গল্প

সঞ্জীব কুমার ঘোষ

মণ্ডল এণ্ড সন্স
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
সুধীরকুমার মণ্ডল
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

মূল্য :—দশ টাকা

মুদ্রাকর
বর্ণশ্রী প্রেস
১/১এ, বৈষ্ণব সম্মিলনী লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রাসঙ্গিক কথা

অংক বা গণিত সম্পর্কে সাধারণভাবে আমাদের মধ্যে এক অদ্ভুত বিকর্ষণবোধ আছে। গণিত নামক বিষয়টিকে ভয়ের চোখে দেখেনা এমন ছেলে মেয়ে আমাদের দেশে বিরল। 'অংকের জ্বর' তো ছোটদের কাছে এক প্রবাদ-বিভীষিকা। এই ভীতির নানা কারণ থাকতে পারে, অন্যতম কারণ অবশ্যই বিষয়টির আপাতরুক্ষতা গাম্ভীর্য আর রসহীনতা। কিন্তু গণিতেরও যে একটি চিত্তাকর্ষক চমকপ্রদ এবং সরস দিক আছে, গণিতেও যে হরেক মজা আছে এটা আমাদের কাছে, বিশেষত ছোটদের কাছে প্রায়-অনুদ্ঘাটিত। এজন্যেই বোধ হয় গণিতের সঙ্গে সাধারণ অনাত্মীয়তা। গণিতের সেই রমণীয় এবং মজাদার দিকটি তুলে ধরে পাঠককে এই দিকে কিছুটা আকর্ষণ করা এই বইয়ের উদ্দেশ্য। গল্পের প্রতি ছোটদের এক সহজাত আকর্ষণ আছে সেজন্যেই এখানে যা-কিছু পরিবেষণ করা হয়েছে তা গল্পের মোড়কে।

অন্যান্য ভাষায় অংকের বিস্তর বই থাকলেও বাংলায় এধরনের বই বেশি নেই। ছোটদের কথা মনে রেখে লেখা হলেও আশা রাখি, বড়োরাও এটি পড়ে আনন্দ পাবেন।

—লেখক

বাংলার শিশু ও কিশোরদের

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত

অবাক পুরস্কার

'মনে কর, পরীক্ষায় খুব ভালো রেজাল্ট করার জন্যে পুরস্কার দিতে চাওয়া হলো। যা খুশি পুরস্কার। তাহলে কী চাইবি ?'

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে রাঙাদা গৌতমের দিকে তাকাল।

তাই তো, কী পুরস্কার চাওয়া যায়। গৌতম ভাবতে লাগল। গৌতমের বন্ধু অনিমেষ সেদিন সুন্দর একটা সাইকেল কিনেছে, গৌতম কদিন ধরেই ভাবছে বাবাকে বলবে ঐ রকম একটা সাইকেল কিনে দেবার জন্যে। ক্রিকেট ব্যাটটা পুরনো হয়ে গেছে। ভালো দেখে একটা ব্যাট আর বল চাইলে হয়। রেকর্ড প্লেয়ার, টি-ভি—সে-ও তো চাওয়া যায়। তাছাড়া থিয়েটার দেখা, মজাসে বেড়ানো এসবও তো আছে। চাওয়ার অনেক কিছুই আছে, ভেবে চিন্তে বলতে হয়। ও রাঙাদাকে বলল, 'অনেক কিছু'।

রাঙাদা হাসল, 'এক রাজা তার মন্ত্রীকে সাধ্যমতো পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন। মন্ত্রী কী পুরস্কার চাইলেন আন্দাজ করতে পারিস ?'

'ও, এই কথা! নিশ্চয়ই অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা।' দীপু সঙ্গে সঙ্গে বলল।

'হলো না। গমের দানা, বুঝলি, মন্ত্রী পুরস্কার চাইলেন স্রেফ কয়েকটা গমের দানা। তাহলে গল্পটা শোন।'

গল্পের কথায় ওরা নড়েচড়ে বসল।

মন্ত্রীর কাজে রাজা খুব খুশি হয়ে বললেন, বলুন মন্ত্রী কী পুরস্কার চান আপনি। আপনার কাজে আমি খুব খুশি। আমার সাধ্য মতো পুরস্কার দিতে চাই আপনাকে। সোনা দানা হীরে জহরত যা চাই, যতো খুশি চাই বলুন।

মন্ত্রী একটু মাথা চুলকে বললেন, সম্রাট মহানুভব। কিন্তু সোনা-

দানা টাকা পয়সা এ সবে আমার একদম আগ্রহ নেই। আমি এ সব কিছুই চাই না। আমি যা চাই তা খুবই সামান্য জিনিস—।

উপস্থিত সবাই চুপ। মন্ত্রী কী বলেন শোনার জন্যে সবাই উন্মুখ।

রাজাও উৎসুক, উৎকর্ণ।

একটু থেমে মন্ত্রী বললেন, মহারাজ, পুরস্কার যদি দিতে হয় তো শুধু কয়েকটা গমের দানা দেবেন আমাকে।

সে-কি! শুধু কয়েকটা গমের দানা? আর কিছু না? সবাই একদম অবাক। এমন আজব পুরস্কার চাওয়ার কথা কেউ কখনো শোনেনি।

রাজা নিজেও কম অবাক হলেন না। গম দিয়ে মন্ত্রী কী করবেন? মন্ত্রীর কি রুটির অভাব?

'ভালো করে ভেবেদেখুন মন্ত্রী,' রাজা বললেন, 'আমার রাজ্যে গমের কোনো অভাব নেই, গম আপনি যতো চান পাবেন। আমি আপনাকে পুরস্কার দিতে চাইছি, আপনি দামী কিছু চেয়ে নিতে পারেন।'

তবু মন্ত্রী গমের দানা ছাড়া আর কিছু চাইলেন না।

রাজামশাই বললেন, 'বেশ, কতো গম চাই আপনার বলুন।'

মন্ত্রী মনে মনে হাসলেন। কাছেই ছিল একটা দাবার ছক। সেটা দেখিয়ে মন্ত্রী বললেন, 'এতে চৌষট্টিটা খোপ আছে; প্রত্যেকটা খোপে কয়েকটা করে গমের দানা রাখতে হবে। তবে যেমন তেমন ভাবে নয়। প্রথম খোপে একটা, দ্বিতীয় খোপে দুটো. তৃতীয় খোপে চারটে, চতুর্থ খোপে আটটা—এইভাবে। তার মানে, প্রত্যেক খোপে তার আগের খোপে যা তার দ্বিগুণ দানা থাকবে। এইভাবে চৌষট্টিটা খোপের জন্যে মোট যা গম হবে আমি তা-ই চাই। ব্যস, আর কিছু না।'

এই কথা! রাজা তখুনি তাঁর লোকজনদের আদেশ দিলেন শস্যাগার থেকে গম নিয়ে আসতে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বস্তাভর্তি

গম এসে গেল। শুরু হয়ে গেল এক, দুই, চার করে খোপের পর খোপে গমের দানা রাখা।

কিন্তু এ কি। অল্প কয়েকটা খোপ ভরতেই যে বস্তার গম শেষ হয়ে গেল। এলো আর এক বস্তা। তাও শেষ। তারপর আরো এক বস্তা। তারপর আরো। শস্যাগারে যতো গম ছিল দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল। সারা রাজ্যের গমের ভাণ্ডার শেষ, তবু আটচল্লিশটা খোপই পুরোপুরি ভর্তি করা গেল না।

রাজামশাই চিন্তিত। তাই তো, এখন কী করা যায়। পুরস্কার দেবার কথা বলে তা না দিতে পারলে রাজার যে আর মান থাকে না।

হঠাৎ রাজার মনে হলো, নিশ্চয়ই তাঁকে বেকায়দায় ফেলার জন্যে মন্ত্রী ভেবেচিন্তেই এমন পুরস্কার চেয়েছে। তিনি তক্ষুনি আদেশ দিলেন মন্ত্রীকে কয়েদে রাখার জন্যে।

বেচারা মন্ত্রী। পুরস্কার চাইতে গিয়ে জুটল কারাগারের শাস্তি।

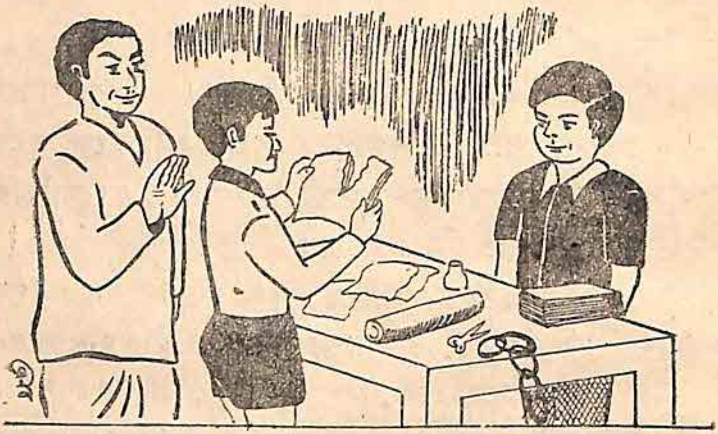
আকাশ ছাড়িয়ে কাগজের মনুমেন্ট

দীপু আর গৌতম খুব ব্যস্ত। কাল বাদে পরশু ওদের স্কুলে ফাংশন। স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস, সেই উপলক্ষে ফাংশন।

ফাংশনে স্কুল-বাড়িকে খুব সুন্দর করে সাজানো হবে। ফুলের তোড়া, কাগজের মালা, কাগজের শেকল এই সব দিয়ে সাজানো হবে। তাছাড়া টুনি বাল্ব তো আছেই।

দীপু খুব ভালো কাগজের মালা, শেকল এইসব বানাতে পারে। তাই ওর ওপর ভার পড়েছে এগুলো বানাবার। বাংলা স্যার ওকে ভার দিয়েছেন বানাবার। স্কুলের ফাংশনের ব্যাপারে বাংলা স্যারই সবকিছু দেখাশোনা করেন কিনা।

লাল, নীল, হলুদ সব রঙীন পাতলা কাগজ নিয়ে দীপু বানিয়ে



রঙীন পাতলা কাগজ দিয়ে দীপু বানিয়ে চলেছে নানা রকম শেকল।

চলেছে নানারকম শেকল আর ফুল। ওকে সাহায্য করছে গৌতম।

'বাঃ, বেশ বানিয়েছিস তো'—রাঙাদা ঘরে ঢুকেই বলল। রাঙাদা খানিকক্ষণ একমনে ওদের কাজ দেখল, তারপর একসময় ঘরের এক কোণে রাখা পাতলা কাগজের বাণ্ডিল দেখিয়ে দীপুকে জিজ্ঞেস করল, 'বাণ্ডিলটায় ক'টা কাগজ আছে জানিস ?'

'হ্যাঁ, আড়াইশো।'

'আচ্ছা, বাণ্ডিলটা কতো পুরু হবে বলতে পারিস ?

প্রশ্ন শুনে থেমে গেল দীপু। 'মেপে দেখছি', বলে ও টেবিল থেকে স্কেলটা আনতে গেল। ততোক্ষণে গৌতম কাগজের বাণ্ডিলের দড়িটা খুলে ফেলেছে।

বাণ্ডিলটা এক হাতে চেপে ধরে দীপু আর এক হাতে স্কেল নিয়ে খুব ভালো করে মেপে দেখল বাণ্ডিলটা কতোটা পুরু। মাপা হয়ে গেলে রাঙাদাকে জানাল—সিকি ইঞ্চির মতো হবে।

'আচ্ছা, ঐ রকম হাজারটা কাগজের বাণ্ডিল কতো পুরু হবে বলতো ?'

'আড়াইশো কাগজে সিকি ইঞ্চি, তাহলে এক হাজার কাগজ নিলে এক ইঞ্চি পুরু হবে।'

'ঠিক বলেছিস। আচ্ছা, এইবার বাণ্ডিল থেকে একটা কাগজ নিয়ে কাগজটার মাঝ বরাবর ছিড়ে দু টুকরো করতো!'

রাঙাদার কথায় অবাক হলো দীপু। আস্ত একটা কাগজকে শুধু শুধু ছিড়বে কী। তবু রাঙাদা যখন বলেছে, ছিঁড়তেই হয়। দেখাই যাক না, কী হয়।

ও একটা কাগজ নিয়ে ছিঁড়ে দু টুকরো করল।

রাঙাদা আবার বলল, 'টুকরো দুটো এক সাথে করে আগের মতো মাঝ বরাবর আবার টুকরো কর।'

রাঙাদার কথামতো টুকরো করে বলল, 'করেছি।'

'মোট কটা টুকরো হলো ?'

'দুটো দুটো চারটে'।

'এবার ঐ চারটে টুকরো এক সাথে ধরে আগের মতো আবার ছিঁড়ে দুভাগ কর।'

এবার ছিঁড়ে টুকরো করতে আগের চাইতে একটু বেশি জোর দিতে হলো। চারটে টুকরোকে দুভাগ করে আটটা টুকরো হলো। রাঙাদা বলল. 'তিনবার ছিঁড়ে আটটা টুকরো পেলি। আচ্ছা আটটা টুকরো একসঙ্গে ধরে যদি আবার দুভাগ করিস, তারপর আবার,—এভাবে মোট পঞ্চাশ বার টুকরো করিস আর টুকরোগুলো এক সাথে একটার ওপর আরেকটা এইভাবে রাখিস তাহলে কতোটা উঁচু হবে বলতে পারিস ?'

'কতো আর হবে, ফুটখানেক।

'আরো বেশি।'

'দশ ফুট ?'

'আরো অনেক বেশি।'

'তাহলে এক মাইল ?'

'ধারে কাছে যেতে পারলি না! প্রায় পৌনে দু কোটি মাইল উঁচু হবে।'

'অ্যাঁ!' দীপু আর গৌতম দুজনেই অবিশ্বাসী চোখে রাঙাদার দিকে তাকাল।

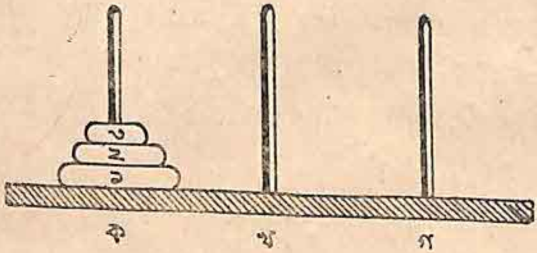
রাঙাদা কাগজ পেন্সিলে হিসেব কষে দেখিয়ে দিল। পঞ্চাশবার টুকরো করা কাগজে আকাশ ছাড়ানো এক বিরাট মনুমেণ্ট তৈরী হয়ে যায়।

কাশীর সেই মন্দির

'কাশীর কথা ভাবলেই আমার কী মনে পড়ে জানিস?'—রাঙাদা খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে দীপুর দিকে তাকায়।

দীপু কাশীতে কখনো যায়নি, তবে কাশীর গল্প শুনেছে অনেক। বইতেও পড়েছে। গঙ্গার ঘাট, বিশ্বনাথের মন্দির, আঁকাবাঁকা অনেক গলি, রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা প্রচুর ষাঁড়, পুরনো পুরনো অনেক বাড়ি কাশীর এই সব কথা ও শুনেছে। কিন্তু রাঙাদা ঠিক কিসের কথা ভাবছে কে জানে। ও রাঙাদার মুখের দিকে উৎসুক চোখে তাকাল।

রাঙাদা বলল, কাশীর কথা ভাবলে আমার ব্রহ্মার সেই মন্দিরের



চাকতিগুলো একটার পর একটা বসান।

কথা মনে পড়ে। মধ্যিখানে পোঁতা তিনটে হীরের শলা আর তার একটাতে বসানো চৌষট্টিটা সোনার গোল চাকতি। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাই নাকি ওগুলো মন্দিরের ভেতর সেই কবে বসিয়ে রেখে যান। চাকতি-

গুলো কিন্তু এক মাপের নয়, প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা মাপের। আর প্রত্যেকটারই মাঝখানে ফুটো আছে। ঐ ফুটো দিয়েই চাকতিগুলো শলার মধ্যে একটার ওপর আর একটা বসানো,—বড়ো থেকে ছোটো, এইভাবে। সব চাইতে বড়োটা নিচে আর সব চাইতে ছোটোটা ওপরে।'

একটু থেমে রাঙাদা আবার বলল, 'মন্দিরে একজন পুরোহিত ঐ চাকতিগুলোকে তুলে বাকি দুটো হীরের শলার একটার মধ্যে বসাবার কাজে ব্যস্ত। তবে যেমন তেমনভাবে নয়। চাকতিগুলো আগে যেভাবে বসানো ছিল, মানে তলার দিকে বড়ো আর ওপরের দিকে ছোটো, ঠিক সেইভাবে। বাকি যে শলাটা রইল দরকার মতো সেটারও সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে হ্যাঁ, একবারে একটার বেশি চাকতি কোনো শলাতেই চাপানো চলবে না। এইভাবে চৌষট্টিটা চাকতির সবগুলোই যখন ঐভাবে সরানো হয়ে যাবে তখনই পৃথিবীর আয়ু শেষ হবে। প্রজাপতি ব্রহ্মা নাকি সেই রকমই বিধান দিয়ে গেছেন।

'পৃথিবী শেষ? অ্যাতো তাড়াতাড়ি?' দীপু চোখ বড়ো বড়ো করে বলে, 'চৌষট্টিটা চাকতি সরাতে আর কতোক্ষণ! পৃথিবী তো তাহলে দু' একদিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবার কথা।'

রাঙাদা হাসল, 'যা ভাবছিস তা নয়। ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিই তাহলে—' বলে রাঙাদা কাগজ পেন্সিল নিয়ে এঁকে দেখাল।

ধর, চাকতিগুলো তলার দিক থেকে আরম্ভ করে ১, ২, ৩, ৪, এইভাবে পরপর নম্বর দেয়া আছে। সবগুলোই প্রথমে বাঁ দিকের শলা ক-এর মধ্য দিয়ে ঢোকানো আছে। নিয়ে যেতে হবে সবগুলোকে গ-এ। ক-এ যেমনভাবে আছে, গ-এ ঠিক তেমনভাবেই বসাতে হবে। একবারে একটার বেশি চাকতি সরানো চলবে না। তাই মাঝে খ-এর সাহায্য নেওয়ার দরকার।

ধরা যাক শুরুতে ক-এ মাত্র দুটো চাকতি আছে। ১ আর ২

নম্বর। ক থেকে গ-এ নিতে হলে কী করতে হবে?

প্রথমে ২ নম্বরকে তুলে খ-এ বসিয়ে রেখে ১ নম্বরকে তুলে নিয়ে গ-এ বসাতে হবে। তারপর ২ নম্বরকে খ থেকে তুলে গ-এ ঢোকাতে হবে। তাহলে ক-এ চাকতি দুটো যেমন ছিল, মানে ১ নম্বর নিচে ২ নম্বর ওপরে, গ-এও ঠিক তেমনভাবে রইল। এতে করে এক এক বারে একটা করে মোট তিনবার চাকতি সরাতে হলো—২-কে খ-এ, ১-কে গ-এ, তারপর ২-কে খ থেকে গ-এ।

যদি ১, ২ আর ৩ নম্বর—এই তিনটে চাকতি থাকে তাহলে পর-পর কীভাবে সরাতে হবে ছাখ।

৩-কে গ-এ, ২-কে খ-এ, ৩-কে খ-এ, ১-কে গ-এ, ৩-কে ক-এ, ২-কে গ-এ, সবশেষে ৩ কে গ-এ।

এইভাবে তিনটে চাকতিই গ-এ চলে গেল। ক-এ যেমন সাজানো ছিল ঠিক তেমনভাবে।

তাহলে তিনটে চাকতির বেলায় মোটমাট সরাতে হলো সাতবার। যদি চারটে চাকতি থাকে তো সরাতে হবে পনেরোবার। পাঁচটার বেলায় ৩১ বার। ছ'টা হলে ৬৩ বার। আর যদি চৌষট্টিটা চাকতি থাকে?

চৌষট্টিটা চাকতির বেলায় এক শলা থেকে আর এক শলায় সবশুদ্ধ সরাতে হবে ১৮৪৪৬৭৪৪০৭৩৭০৯৫৫১৬১৫ বার! এতোবার সরাতে সময় কতো লাগবে? প্রত্যেকবার চাকতি সরাবার জন্যে খুব কম করেও যদি এক সেকেণ্ড সময় ধরা হয় তাহলে ৩ কোটি ১৫ লাখ ৩৬ হাজার বার সরাতেই বছর ঘুরে যাবে। তাও আবার নাওয়া খাওয়া বাদ দিয়ে যদি দিন রাত্তির চব্বিশ ঘণ্টা একনাগাড়ে কাজ করা হয় আর সব কিছু একেবারে নির্ভুলভাবে করা হয়, তবেই। আর পুরো কাজটা শেষ করে উঠতে? কমসে কম ষাট হাজার কোটি বছরের ধাক্কা।

ষাট হাজার কোটি! দীপু আর গৌতম যেন ভাবতেই পারে না।

পৃথিবীর আয়ু শেষ না হলেও ষাট হাজার কোটি বছর বাদে পৃথিবীর চেহারা যে একদম বদলে যাবে এটা অবিশ্যি আন্দাজ করা যায়।

অংক জানা চোর

গতকাল রাত্তিরে অনিমেষদের বাড়িতে চুরি হয়ে গেছে। অনিমেষের ছোটকাকু রাত জেগে পরীক্ষার পড়া তৈরী করছিল। পড়তে পড়তে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

অনিমেষের ছোটকাকু অনেক দামী দামী বই পত্তর নিয়ে পড়া-শুনো করে। চোর কোন এক ফাঁকে ঘরে ঢুকে বস্তাভর্তি করে সব বই নিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে। দীপু আর গৌতম তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল।

চোরের কথায় রাঙাদার এক গল্প মনে পড়ল। রাঙাদা বলল, 'আমি এক চোরের গল্প বলব যে রীতিমতো অংকে ওস্তাদ। এরকম চোর অবিশ্যি চট করে দেখা যায় না।'

গল্পটা এই রকম—

রাজ্য জুড়ে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। রাজপ্রাসাদে চুরি। তাও কিনা ভর-দুপুরে!

দুপুরবেলা প্রাসাদের সবাই ঘুমিয়ে। রাজামশাই খাওয়াদাওয়া সেরে প্রাসাদের একটা ঘরে পাত্রমিত্র জনাকয়েককে নিয়ে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে একটু গল্পগুজব করছিলেন, এমন সময় কোটাল হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবরটা দিল।

চুরির কথা শুনে রাজা থেমে গেলেন। মুখ থেকে আলবোলার নলটা খসে পড়ল।

ব্যাপারটা হয়েছে কি, দুপুরবেলা রক্ষীরা সবাই যখন ঢুলছিল তখন প্রাসাদের পেছন দিকে রাজার পুঁথিঘরে একটা লোক কোন এক ফাঁকে সুড়ুত করে ঢুকে পড়ে। দুখানা মোটা মোটা পুঁথি

বগলদাবা করে চোর পা টিপে টিপে সরে পড়ছিল। কিন্তু কপাল খারাপ, চৌকাঠ পার হবার সময় ঘটল বিপত্তি। দরজার চৌকাঠ পার হতে গিয়ে সে হোঁচট খেল। আর হোঁচট খেয়ে পড়বি তো পড় একেবারে রক্ষীর গায়ে।

রক্ষী প্রথমটায় ঘাবড়ে গেল। ধড়মড়িয়ে গা-ঝাড়া দিয়ে এক পাশে সরে গেল, পরক্ষণেই চোখে ঢুলুনিভাব কেটে যেতেই সোজা উঠে দাঁড়াল।

চোর ততক্ষণে দে দৌড়। আর রক্ষীও ছুটল চোরের পিছু পিছু। কিন্তু বেশি দূর যেতে হলো না, প্রাসাদের সদর দরজার কাছাকাছি যেতেই রক্ষী চোরকে জাপটে ধরে ফেলল।

রাজার আদেশে চোরকে হাজির করা হলো সামনে।

উপস্থিত সবাই চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে রইল চোরের দিকে। রোগা লিকলিকে চেহারা। চোখে চশমা, উস্কো-খুস্কো চুল, গায়ে আলখাল্লার মতো জামা। দেখে ঠিক চোর বলে মনে হয় না।

রাজা একটু অবাক হলেন। প্রাসাদে এত জিনিষ থাকতে সব-কিছু ছেড়ে লোকটা পুঁথিঘরে ঢুকল কেন।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি পুঁথিঘরে চুরি করতে ঢুকেছিলে ? লোকটা কিছু না বলে মাথা নিচু করে রইল। রাজা বললেন, রাজপ্রাসাদে চুরি করার কী শাস্তি জানো ?

লোকটা এবারেও চুপ করে রইল।

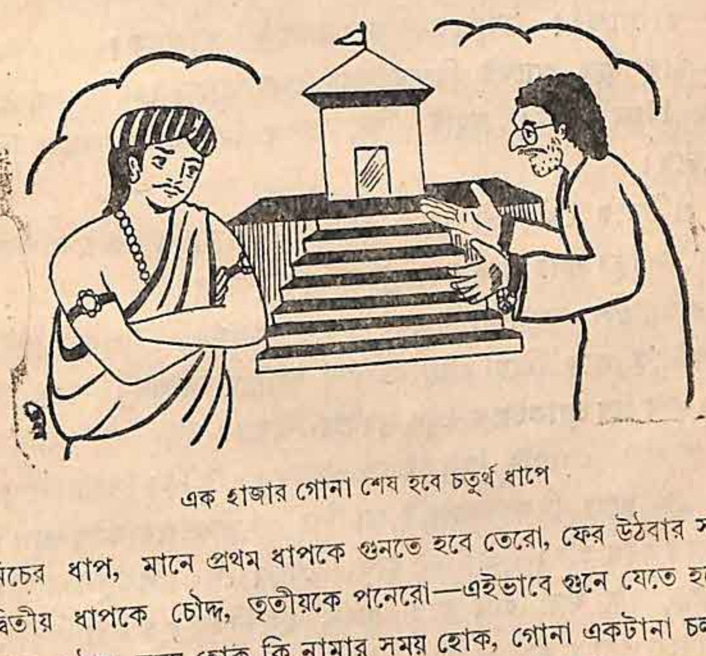
উপস্থিত কেউ কেউ বলল, ওকে বেশ কয়েক ঘা বেত মারা উচিত। আবার কেউ বা বলল, ওকে শূলে চড়ানো উচিত।

রাজা সবাইকে থামিয়ে দিয়ে রাজ-পণ্ডিতকে ডেকে পাঠালেন পরামর্শের জন্যে।

রাজপণ্ডিত এলে তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে রাজা বললেন, দেখে মনে হচ্ছে লোকটা জ্ঞানী। পড়াশুনো করে। নইলে অন্য সব

কিছু ছেড়ে পুঁথিঘরে ঢুকবে কেন চুরি করতে। আমি ওকে অল্পস্বল্প শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দিতে চাই। শাস্তির ভারটা আমি আপনার ওপরই ছেড়ে দিলাম। কী শাস্তি দেওয়া যায় আপনিই ঠিক করুন।

পণ্ডিত কয়েক সেকেণ্ড ভাবলেন, তারপর চোরকে একটা মন্দিরের সামনে নিয়ে গেলেন। মন্দিরের সাতটা সিঁড়ি। চোরকে মন্দিরের সিঁড়ি গুনে বারকয়েক ওঠা-নামা করতে হবে। এক দুই করে গুনতে গুনতে সপ্তম বা শেষ ধাপে উঠেনামবারসময় শেষের আগের ধাপ, মানে ষষ্ঠ ধাপকে আট, পঞ্চম ধাপকে নয়, ঐভাবে গুনতে গুনতে একেবারে



এক হাজার গোনা শেষ হবে চতুর্থ ধাপে

নিচের ধাপ, মানে প্রথম ধাপকে গুনতে হবে তেরো, ফের উঠবার সময় দ্বিতীয় ধাপকে চৌদ্দ, তৃতীয়কে পনেরো—এইভাবে গুনে যেতে হবে। মানে, ওঠার সময় হোক কি নামার সময় হোক, গোনা একটানা চলতে থাকবে। এইভাবে এক হাজার গোনা শেষ হলেই ছুটি। তবে হ্যাঁ, কোন্ ধাপে এসে এক হাজার গোনা শেষ হলো ঠিক ঠিক বলতে হবে। কোনো ভুলচুক হলেই ফের প্রথম থেকে শুরু করতে হবে।

উপস্থিত সবাই বলল, ঠিক হয়েছে, এইবারেই বাছাধন বুঝবে

মজা। এই গনগনে রোদ্দুরে বারকয়েক ওঠানামা করতেই বাছাধনের জিভ বেরিয়ে যাবে।

সবাই অপেক্ষা করছে ব্যাপারটা দেখার জন্যে।

কিন্তু যাকে নিয়ে এসব কাণ্ড সেই চোর কী করছে?

শাস্তির কথা শুনে চোর কিন্তু মোটেই ঘাবড়ালো না। সে কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে কী ভাবলো, তারপর পণ্ডিতের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি সিঁড়ি ওঠানামা না করেই বলে দিচ্ছি এক হাজার গোনা কোথায় শেষ হবে। এক হাজার গোনা শেষ হবে চতুর্থ ধাপে।

কী আশ্চর্য! চোর কেমন করে বলল? আন্দাজে?

রাজপণ্ডিত আগেই হিসেব করে রেখেছিলেন, চোরের কথা তার সঙ্গে মিলে গেছে। সবাই কিন্তু ভাবল লোকটা আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছে।

পণ্ডিতকে কৌতূহলী দেখে চোর শুকনো মাটির এক ঢেলা তুলে নিয়ে, সিঁড়ির ওপর অংক কষে বুঝিয়ে দিল সবকিছু।

রাজপণ্ডিত অবাক। সেই সঙ্গে মুগ্ধও। তিনি তক্ষুণি লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে রাজাকে গিয়ে সবকিছু বললেন। রাজা সব শুনে খুশি হয়ে লোকটাকে প্রচুর পুরস্কার দিলেন।

আসলে লোকটা ছিল অংকে ওস্তাদ। সিঁড়ির সংখ্যা সাত, তাই সে ছয়ের দ্বিগুণ সংখ্যা বারো দিয়ে এক হাজারকে ভাগ করল। ভাগশেষ পেল চার। তাই এক হাজার গোনা শেষ হবে চতুর্থ ধাপে। ভাগশেষ এক হলে ধাপ হতো প্রথম, দুই কিংবা শূন্য হলে দ্বিতীয়, তিন কিংবা এগারো হলে তৃতীয়—এইরকম।

রাজার ধাঁধা

এবার আর একটা গল্প শোন।

একটিপ নস্যি নিয়ে রাঙাদা দীপু আর গৌতমের দিকে আড় চোখে তাকায়। বোধ হয় গল্পের কথায় ওদের মুখের ভাবটা কেমন হয় তাই বুঝতে চায়। ওরা তো গল্প শোনার জন্যে তৈরীই। আসলে রাঙাদাকে গল্পের জন্যে বেশিরভাগ সময়ই সাধাসাধি করতে হয়। রাঙাদা বলে, গল্পের জন্য মুড চাই বুঝলি, আর সেই সঙ্গে চাই এক কাপ চা। ওদের তখন এক কাপ চায়ের ব্যবস্থা করতেই হয়।

আজ রাঙাদার মুড ভালো, তাই নিজেই গল্প শোনাতে চাইল, আর রাঙাদার নিজের থেকে গল্প বলার প্রস্তাবে দীপু আর গৌতম প্রথমটায় একটু অবাক হলো। তারপর খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওরা রাঙাদার একেবারে কাছ ঘেঁষে বসল।

রাঙাদা বলল, এটাও এক রাজার গল্প। একটা কথা খেয়াল করিস, আজকালকার দিনে রাজা রাজড়ার সেরকম চল না থাকলেও রাজারা কিন্তু বেঁচে আছেন। বেঁচে আছেন সব গল্পের মধ্যে। এখন যে রাজার কথা বলছি উনি আর পাঁচটা রাজার মতো বিলাসী আর আয়েসী নন। একটু অন্য রকমের। গল্পটা তাহলে শোন—

এরকম রাজ্য বড়ো একটা দেখা যায় না। হৈ-চৈ গোলমাল নেই, ঝগড়াঝাটি মারামারি নেই, খুন খারাবি থানা-পুলিশ এসব কিচ্ছু নেই। কারো কোনো দুঃখ-কষ্ট নেই, সবাই বেশ সুখে-শান্তিতে দিন কাটায়।

প্রজার সুখেই রাজার সুখ। প্রজারা সুখে শান্তিতে থাকায় রাজাও সুখী। প্রজাদের এই সুখ শান্তি যাতে নষ্ট না হয়, রাজ্যের যাতে আরো উন্নতি হয় তার জন্য রাজা সব সময়ই চেষ্টা করেন। মাঝে মাঝে তিনি ছদ্মবেশে রাজ্যের নানা জায়গা ঘুরে বেড়ান সবকিছু

নিজের চোখে দেখার জন্যে। কোথাও কোনো ত্রুটি দেখলে তিনি তক্ষুণি তা দূর করার ব্যবস্থা নেন।

এত সুখের মধ্যেও কিন্তু একটা চিন্তা থেকে থেকেই রাজার মনের মধ্যে খোঁচা মারে। ব্যাপারটা হলো গিয়ে, রাজার বয়স হয়েছে অনেক, চোখেও আজকাল ভালো দেখেন না। তার ওপর মাঝে মধ্যে অসুখ-বিসুখ শরীরটাকে বেশ কাবু করে ফেলে। তাই উপযুক্ত এমন কাউকে ঠিক করা দরকার যার ওপর নিশ্চিন্তে রাজ্যের ভার দেওয়া যায়। কিন্তু মুশকিল হলো সেরকম কাউকে এখন অব্দি চোখে পড়ছে না।

নিজের একমাত্র ছেলে গঙ্গারামের ওপর রাজার বিশ্বাস নেই একটুও। সে কেবল খায়দায় ঘুমোয় আর বন্ধুবান্ধব নিয়ে গল্পগুজব করে। বিরাট মোটাসোটা শরীর নিয়ে মাঝে মাঝে নদীর ধারে বেড়াতে যায়। রাজকার্য বুঝতে তার একদম ইচ্ছে নেই। সে রকম বুদ্ধিও তার নেই।

একদিন রাজা গঙ্গারামকে ডেকে বললেন, দেখ তো, প্রাসাদের সদর দরজার কাছে ভিন রাজ্যের কয়েকজন লোক নাকি বসে আছে। কী ব্যাপার, ওরা কী চায় জেনে এসো তো।

রাজকুমার গিয়ে কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে রাজাকে বলল, আমি জেনে এসেছি ওরা কী চায়, ওরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

রাজা বললেন, ওরা কারা, কোথায় থাকে ?

—তা তো জিজ্ঞেস করিনি।

—ওরা কতো জন এসেছে ?

—তা তো গুনিনি।

—আমার সঙ্গে কী জন্যে দেখা করতে চাইছে ?

—তা তো জানিনা।

—ওদের হাতে চিঠিপত্তর বা দরখাস্ত বা কোনো কাগজ-টাগজ আছে ?

—তা তো খেয়াল করিনি।

রাজা ভাবলেন, এরকম লোকের হাতে রাজ্যের শাসনভার। দেওয়া নিরাপদ নয়।

তাহলে উপায় ?

রাজা মনে মনে ঠিক করলেন রাজ্যের মধ্য থেকেই, মানে প্রজাদের মধ্য থেকেই কাউকে ঠিক করতে হবে। যোগ্য লোক বাছাই করার জন্য রাজা নিজেই রাজ্যের নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে খোঁজ করতে লাগলেন।

একদিন হয়েছে কি, রাজা যখন ছদ্মবেশে ঘুরছেন তাঁর কানে এলো একজন চায়ের দোকানী কম ওজন দিয়ে লোককে ঠকাচ্ছে। বাজারের কাছে পাশাপাশি তিনটে চায়ের দোকান। সব দোকানেই চায়ের প্যাকেটগুলো একই ওজনের আর দেখতেও হুবহু একই রকমের। প্রত্যেকটা প্যাকেটের ওজন একশো গ্রাম। ওরই মধ্যে একজন দোকানী প্রত্যেক প্যাকেট থেকে কায়দা করে এক গ্রাম সরিয়ে রাখে। এমনভাবে রাখে যে প্যাকেট দেখে ধরার উপায় নেই। আর ঐ দোকান থেকে যারা চায়ের প্যাকেট কেনে তারা না জেনেই ঠকছে। প্যাকেট পিছু এক গ্রাম চা কম পাচ্ছে।

রাজা শুনে ভয়ানক চটে গেলেন। এমন কাজ কার ? তাকে শাস্তি দিতেই হবে। হোক না কেন মাত্র এক গ্রাম, তাই বা কম দেবে কেন ? তাঁর রাজ্যে কাউকে ঠকানো চলবেনা।

তিন দোকানীর মধ্যে কে ওজনে ঠকাচ্ছে বার করতেই হবে। বার করা অবিশ্যি কোনো শক্ত ব্যাপার নয়। প্রত্যেক দোকান থেকে প্যাকেট নিয়ে আলাদা করে ওজন করলেই ধরা পড়বে কার প্যাকেটের ওজন কম।

কিন্তু রাজা ভাবলেন, বার বার নয়, একবারমাত্র ওজন করেই বার করতে হবে তিন দোকানীর মধ্যে কে ঠকবাজ।

প্রাসাদে ফিরে রাজা বাড়ি বাড়ি লোক পাঠালেন কে এটা

সব চাইতে সহজভাবে করতে পারে। প্রত্যেককেই বলে দেওয়া হলো ব্যাপারটা আর কাউকে জানানো চলবে না বা কারো সঙ্গে পরামর্শ করা চলবে না।

একটা দিন সময় দেওয়া হলো। যে যে পারবে পরদিন সকাল নটার মধ্যে রাজাকে জানিয়ে আসতে হবে।

রাজা মনে মনে ঠিক করলেন সব চাইতে সহজভাবে যে এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে তাকেই দেশের পরবর্তী রাজা করা হবে।

দোকানীদের কেউ কিন্তু ব্যাপারটা জানতেও পারিল না।

পরদিন সকালে কেউ এল না। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যায় যায়, নটা প্রায় বাজে তবু কারো দেখা নেই। ব্যাপারটা কী ?

তাহলে কি রাজ্যে এমন কেউ নেই যে একবার মাত্র ওজন করে অসাধু দোকানদার ধরার কায়দাটা বাতলাতে পারে ? মাথাওয়ালা লোক কি রাজ্যে কেউ নেই ?

ঠিক নটার সময় খবর এলো দুজন লোক রাজার সঙ্গে দেখা করতে চায়। একজনের নাম ইন্দ্র, আর একজনের নাম চন্দ্র।

প্রথমে চন্দ্রের ডাক পড়ল। চন্দ্র বলল, মহারাজ, একবার মাত্র ওজন করে ঠকবাজ দোকানীকে ধরার কায়দাটা অনেক মাথা ঘামিয়ে বার করেছি। বলছি শুনুন। প্রথম দোকান থেকে একটা, দ্বিতীয় দোকান থেকে দুটো আর শেষের দোকান থেকে তিনটে প্যাকেট নিতে হবে। এই ছটা প্যাকেট একসাথে ওজন করলে মোট ওজন হওয়া উচিত ছশো গ্রাম। কিন্তু তা না হয়ে কিছু কম হবে। যদি এক গ্রাম কম হয় তো বুঝতে হবে কম ওজনের প্যাকেট এসেছে প্রথম দোকান থেকে দু গ্রাম কম হলে দ্বিতীয় দোকান থেকে আর তিন গ্রাম কম হলে তৃতীয় দোকান থেকে। এভাবেই ধরা যাবে কম ওজনের দোকান কোন্‌টা।

রাজা সব শুনলেন। তারপর ইন্দ্রকে ডাকলেন।

ইন্দ্র বলল, মহারাজ, মাত্র তিনটে প্যাকেট ওজন করলেই সব বোঝা যাবে। প্রথম দোকান থেকে কোনো প্যাকেট নেবার দরকার নেই। নিতে হবে দ্বিতীয় দোকান থেকে একটা আর তৃতীয় দোকান থেকে দুটো। এই তিনটে প্যাকেট এক সাথে ওজন করলে মোট ওজন যদি ঠিক তিনশো গ্রামই হয় তো বুঝতে হবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয়



মাত্র তিনটে প্যাকেট ওজন করেই ধরা পড়বে।

দোকানে কোনো গোলমাল নেই, গোলমাল আছে প্রথম দোকানে। মোট ওজন ঠিক তিনশো না হয়ে যদি এক গ্রাম কম হয় তাহলে বুঝতে হবে দ্বিতীয় দোকানের প্যাকেট কম ওজনের। দু গ্রাম কম হওয়ার মানে তৃতীয় দোকানের প্যাকেটের ওজন কম।

রাজা দেখলেন, ইন্দ্রের কায়দাটাই সব চাইতে সোজা আর সব চাইতে বুদ্ধির। ঐ-কায়দাটাই দেখা গেল প্রথম দোকানের প্যাকেটেই ওজন কম। রাজা তক্ষুণি ঐ দোকানীকে কারাগারে পুরবার হুকুম দিলেন। আর ঘোষণা করলেন, ইন্দ্রই হবেন দেশের পরবর্তী রাজা।

আর চন্দ্র? তাকেও রাজা পুরস্কার দিলেন।

কয়েকটা ধাঁধা

সকাল থেকেই আকাশ কালো হয়ে ছিল। দেখতে দেখতে বৃষ্টি নামল। প্রথমে টিপ টিপ করে, তারপর ঝম ঝম। বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই, থামবার নাম নেই। এই বৃষ্টিতে দুটো জিনিস ভালো লাগে। এক, তেলেভাজা দিয়ে মুড়ি, দুই গল্প। প্রথম জিনিসটা হাতের কাছে নেই, কিনে আনবারও উপায় নেই, কারণ এমন বৃষ্টিতে বাইরে বেরুনোই দায়। কাজেই গল্প। দীপু আর গৌতম রাঙাদাকে ধরল গল্প শোনাবার জন্যে।

রাঙাদাও যেন মনে মনে তৈরী হচ্ছিল ঐরকম কিছুর জন্যে। দীপু আর গৌতমের কথা শুনে আস্তে আস্তে মাথা দোলাতে লাগল। কিছু একটা ভাবছে এইভাবে চোখ বুঁজে ভুরু কুঁচকে রইল খানিকক্ষণ। তারপর এক সময় চোখ খুলে বলল, 'কয়েকটা ধাঁধা মনে আসছে, শুনবি?'

তা মন্দ কী! রাঙাদা এর আগেও ধাঁধা শুনিয়েছে। ভালোই লেগেছে। ধাঁধা তো গল্পের মতোই। তবে বুদ্ধির খেলাও আছে ওতে।

দীপু আর গৌতম এক সঙ্গে বলে উঠল, 'শুনব'।

একটিপ নস্যি নিয়ে রাঙাদা ধাঁধা শোনাতে আরম্ভ করল—

নৌকো পারাপারের সমস্যা

রামু আর দামু আগেই বায়না ধরেছিল পরীক্ষার পর ক'টা দিন মামাবাড়ি বেড়িয়ে আসবে। পরীক্ষা শেষ হবার পরদিন ছোট মামা এসে হাজির। ওরা মোটামুটি তৈরীই ছিল, ছোটমামার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। মামাবাড়ি কাছেই একটা ছোটো নদী, ঐ নদী পেরিয়ে মামা-বাড়ি যেতে হবে। ছোটমামার সঙ্গে ট্রেন থেকে নেমে ওরা যখন নদীর কাছে এসে পৌছল তখন সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছে। সেদিন শীতটাও

বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। তাই নদীতীর ফাঁকা। লোকজন প্রায় নেই। অনেক ডাকাডাকি করেও কোনো মাঝির দেখা পাওয়া গেল না। হঠাৎ ছোটমামার নজরে পড়ল দূরে ছোট্ট একটা নৌকো দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে। কী আর করা, ঠিক হলো, ঐ নৌকোতেই সবাই নদী পার হবে। কিন্তু মুশকিল হলো নৌকোটা বড্ড ছোটো। একসঙ্গে তিনজন উঠলে নৌকো ডুবে যায়। তিনজন কেন, ছোটমামার সঙ্গে রামু বা দামু যে-কোনো একজন উঠলেও নৌকো ডোবে। হয় ছোট-মামা একা, নয়তো বড় জোর রামু আর দামু একসঙ্গে নৌকোয় উঠতে পারে। সমস্যা হলো তিনজন ওপারে যায় কী করে।

নৌকো পারাপারের আর এক সমস্যা

আজ হাটবার। নদীর ওপারে গঞ্জে হাট বসেছে। হাটে অনেক রকম জিনিসের বিকিকিনি হয়। অনেক দূর থেকে লোক আসে হাটে নানা জিনিস কিনতে। এপার থেকে আবদুল মাঝিও নৌকো বেয়ে ওপারে হাটে গেছে কেনাকাটা করতে। সঙ্গে পোষা কুকুর।

আবদুল মাঝি ঘুরে ঘুরে আগে কিছু তরিতরকারি কিনল। তার-পর একজায়গায় দেখল একটা লোক একটা ছাগলছানা নিয়ে বসে আছে বিক্রি করবার জন্যে। আবদুল মাঝির অনেকদিনের শখ একটা ছাগল পোষে। কিন্তু এতদিন কিনব কিনব করেও আর ছাগল কেনা হয়ে ওঠেনি। আবদুল ঠিক করল দামে পোষালে ছাগলছানাটা কিনে ফেলবে।

দরদস্তুর করে আবদুল ছাগলটা কিনে নিল লোকটার কাছ থেকে। তরিতরকারি আর ছাগলছানা কিনতেই সব টাকা শেষ। হাতে আর টাকা নেই। কাজেই আর ঘোরাঘুরি করার মানে হয় না। আবদুল মাঝি তাই তরকারির বোঝা মাথায় চাপিয়ে এক হাতে সদ্য কেনা ছাগলছানা আর এক হাতে পোষা কুকুরের গলায় বাঁধা দড়ি ধরে এগিয়ে চলল তীরের দিকে যেখানে নৌকো ভেড়ানো রয়েছে। কিন্তু মুশকিল হলো ঐ ফেরার সময়ই।

নৌকোটা এত ছোট যে কুকুর, ছাগলছানা আর তরকারির আঁটি এই তিনের যে-কোনো একটাকে সঙ্গে নেওয়া চলে। আবার কুকুরটা ছাগলছানাটার দিকে মাঝে মাঝে যে ভাবে তেড়ে আসছিল তাতে একলা পেলে হয়তো ছাগলছানাটার ঘাড়ই মটকে দেবে। ছাগল-ছানাটা আবার সুযোগ পেলে তরকারির আঁটি সাবাড় করবে। এদিকে এপাড়ে দড়ি বাঁধবার মত কোনো খুঁটিই নেই। তাহলে উপায়? সবাইকে ওপারে নেয় কী করে?

ডিম বিক্রি

গাঁয়ের পাশে হাট বসেছে। অধর মণ্ডল ছেলের হাতে গোটা-কয়েক ডিম দিয়ে বলল, যা, এগুলো হাটে বিক্রি করে দিয়ে আয়।

মণ্ডলদের অবস্থা মোটামুটি মন্দ নয়। বিঘে কয়েক জমি আছে আর আছে বেশ কয়েকটা হাঁস মুরগী। জমির ফসল আর হাঁস মুরগীর ডিম বেচে মোটামুটি ভালোভাবেই চলে যায় অধর মণ্ডলের।

বাবার কথামতো ডিমগুলো একটা ঝোলায় পুরে নফর চলল হাটের পথে ডিম বেচতে। হাটে গিয়ে কিন্তু নফরকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। ডিমগুলো ভালো ছিল, তাই হাটে যেতে না যেতেই বেশির ভাগ ডিম বিক্রি হয়ে গেল। তিনটে ডিম অবিশ্যি তখনও বাকি বিক্রি হতে। নফর ঠিক করল ঐ তিনটে ডিম বেচবে না, বাড়ি নিয়ে যাবে খাবার জন্যে। পয়সাগুলো গুণে নিয়ে ডিম তিনটে নিয়ে নফর বাড়ি ফিরে চলল।

অধর মণ্ডল চাষের কাজ দেখতে ক্ষেতের দিকে যাচ্ছিল, দূর থেকে নফরকে দেখে ফিরে দাঁড়াল। বললল, 'কিরে, এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলি, একজনই বোধ হয় তোর সব ডিম কিনে নিয়েছে?'

'না বাবা, একজন নয়, তিনজন। আর সব ডিম বিক্রি করিনি, তিনটে ফেরত নিয়ে এসেছি খাব বলে।'

'বেশ করেছিস, তা কাকে কটা ডিম দিলি?'

নফর একটু কায়দা করে বলল, 'প্রথমে যে কিনতে এল সে নিল

মোট যা ডিম ছিল তার অর্ধেক আর সেই সঙ্গে একটা ডিমের অর্ধেকটা। তারপর যে এল সে বাকি ডিমের অর্ধেক আর তার সঙ্গে একটা ডিমের অর্ধেক নিল। এবার যা রইল তার অর্ধেক আর সেই সঙ্গে একটা ডিমের অর্ধেক তৃতীয় লোকটা নিল।'

অধর মণ্ডল চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, 'সে কী রে! একটা ডিমের অর্ধেক কী বলছিস? ভাঙ্গা ডিম আবার কেউ কেনে নাকি?'

'না বাবা, ডিম ভাঙ্গতে যাব কেন!'

অধর মণ্ডল ঠিক বুঝতে পারল না। নফরের কথায় ধাঁধা লাগছে।

পাঠক কিছু বুঝলে? নফর কটা ডিম নিয়ে হাটে গিয়েছিল, আর কাকে কটা ডিম বেচল?

পল্টুর লেমনেড খাওয়া

শনিবারের দুপুর। স্কুলে হাফ ছুটি সেদিন। পল্টু অন্যদিন ছুটির পর বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে করতে বাড়ি ফেরে, কিন্তু সেদিন একা একাই বাড়ির পথে হাঁটা দিল। স্কুল থেকে বাড়ি বেশ খানিকটা রাস্তা। যেতে যেতে পল্টুর জলতেষ্টা পেল। ভীষণ জলতেষ্টা। কিন্তু কাছাকাছি কোনো জলের কল নেই। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল একটা দোকানে সারি সারি লেমনেডের বোতল সাজানো। পল্টু পকেটে হাত দিয়ে দেখল ছোটকাকুর কাছ থেকে নেয়া দুটো টাকাই পকেটে রয়েছে। কাজেই দেরি না করে ও চট করে দোকানে গিয়ে একটা লেমনেড খেয়ে নিল। যাক বাবা, এতক্ষণে গলাটা তো ভিজল। যা তেষ্টা পেয়েছিল!

এবার দাম দেওয়ার পালা। পল্টু দোকানীকে লেমনেডের দাম জিজ্ঞেস করল। দোকানী একটু অদ্ভুত রকমের। কোনো কথা সোজা-সুজি বলতে জানেনা। কায়দা করে ঘুরিয়ে কথা বলাই তার স্বভাব। মাথা ঝাঁকিয়ে হাত নেড়ে সে বলল, 'ত্যাখো ভাই লেমনেড সুদ্ধু বোতলের দাম হলো গিয়ে দু টাকা। তা তুমি তো লেমনেড খেয়ে

বোতলটা ফেরত দিলে, কাজে কাজেই বোতলের দামটা এর থেকে বাদ যাবে। আর বোতলের দামের কথাই যদি বলো তো বলি লেমনেডের দাম খালি বোতলের দামের চাইতে দেড় টাকা বেশি। কাজেই শুধু বোতলের দাম হলো গিয়ে—'

'বুঝেছি, বুঝেছি! পঞ্চাশ পয়সা।' পল্টু হাত নেড়ে বলল।

'উঁহু, হলো না।'

কার কথা ঠিক? পল্টুর, না দোকানীর?

খুচরো পয়সার সমস্যা

পিসিমার অসুখের খবর পেয়ে আমাদের বরেনবাবু সাতসকালেই বেরিয়ে পড়লেন পিসিমাকে দেখতে। বেশি দূরে নয়, মাত্র দুটো ইষ্টিশান বাদেই পিসিবাড়ি। ট্রেনভাড়া চৌত্রিশ পয়সা। বেলা বাড়লে ভিড় হবে তাই ভিড় এড়াবার জন্যে বরেনবাবু সকাল সকাল ট্রেন ধরতে চললেন।

ইষ্টিশানে টিকিট কাউন্টার একরকম ফাঁকা। বরেনবাবু টিকিট চেয়ে টিকিটবাবুর দিকে এক টাকার একটা নোট এগিয়ে দিলেন। কিন্তু বাকি পয়সা ফেরত দিতে গিয়েই টিকিটবাবু পড়লেন সমস্যায়। খুচরো পয়সা বলতে তার কাছে মাত্র একটা আধুলি আর একটি সিকি রয়েছে, অথচ ফেরত দিতে হবে ছেষট্টি পয়সা। এদিকে টিকিটবাবুর অনুরোধে বরেনবাবুও পকেট হাতড়ে দেখেন তার কাছে আর কোনো পয়সা নেই কেবল একটা তিন পয়সা এবং একটা দু পয়সা ছাড়া।

কাছাকাছি এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি টিকিটবাবুকে বললেন, 'আমার কাছে দুটো দশ পয়সা, একটা পাঁচ পয়সা, একটা দু পয়সা আর একটা এক পয়সা, মোট এই আঠাশ পয়সা আছে। এতে কি আপনার সুবিধে হবে?'

টিকিটবাবু দু তিন সেকেণ্ড ভেবে বললেন, 'হবে।'

কিভাবে সমস্যার সমাধান হলো, মানে বরেনবাবু বাকি পয়সা ফেরত পেলেন আর ভদ্রলোকও ফেরত পেলেন তাঁর আঠাশ পয়সা?

ওজনের কায়দা

শিউমঙ্গল পাণ্ডে বুদ্ধিমান ব্যাপারী। কোত্থেকে চারটে পাথরের টুকরো জোগাড় করেছে আর তাই দিয়েই দিব্যি খদ্দেরকে চাল ডাল এসব ওজন করে দিচ্ছে। বাটখারা ছাড়াই।

পাথরগুলো এক সাইজের নয়, চারটে চার রকমের। সব চাইতে বড়োটার ওজন ২৭ কিলো, আর সব চাইতে ছোটটা ১ কিলো। বাকি দুটোর একটা ৩ কিলো আর একটা ৯ কিলো ওজনের। শিউমঙ্গল ওজন করে দেখেছে।

বাটখারার বদলে পাথর দিয়ে ওজন করা নিয়ে অবিশ্যি কোনো ঝামেলা হয় না। খদ্দেররা শিউমঙ্গলকে যথেষ্ট বিশ্বাস করে। দু কিলোই হোক আর পাঁচ কিলোই হোক পাথর চাপিয়েই শিউমঙ্গল ঝপাঝপ চাল ডাল ওজন করে দিয়ে দেয়। ওজনে কোনোই ফাঁকি নেই।

শিউমঙ্গলের কায়দাটা কী? মাত্র ঐ চারটে পাথর দিয়ে ও যে-কোনো ওজন মেপে দেয় কেমন করে? অবিশ্যি ভগ্নাংশ বাদ দিয়ে। মানে, সোয়া, সাড়ে, পৌনে এইরকম সব ওজন বাদে।

ভাই-বোন

পাশের বাড়ির সামনের খোলা জায়গাটায় দুটি ফুটফুটে ছেলে-মেয়ে এক্কা দোক্কা খেলছে। দেখলেই বোঝা যায় ভাইবোন। ও বাড়িতে নতুন এসেছে।

এ বাড়ির পটলবাবু খুব মিশুকে লোক। ওদের সঙ্গে ভাব জমাবেন ঠিক করলেন। ওদের বাবার সঙ্গে এখনও আলাপটা হয়নি, ভদ্রলোক নাকি সাতসকালে বেরিয়ে যান, ফেরেন রাত্তিরে। আলাপের সুযোগটা তাই এখনো হয়নি। তা না হোক, ঐ ভাই-বোন দুটির সঙ্গেই আগে আলাপ জমানো যাক।

খেলা শেষ হতে পটলবাবু ছেলেমেয়ে দুটিকে কাছে ডাকলেন। ছেলেটিকে জিগ্যেস করলেন, 'তোমার নাম কী?'

'মিলন। মিলন মিত্র। সবাই মিলু বলে ডাকে।'

'বাঃ, বেশ নামটি তোমার।'

তারপর মেয়েটির দিকে ফিরে পটলবাবু বলেন, 'আর তোমার নাম?'

'ঝুমুর। সবাই ঝুমু৷ বলে ডাকে।'

'আচ্ছা মিলু, তোমরা ক ভাই-বোন?'

'দেখুন, আমার বোন যতো, ভাইও ততো।'

পটলবাবু কিছু না বুঝতে পেরে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

অমনি ঝুমা বলে উঠল, 'জানেন, আমার বোন যতো ভাই তার দ্বিগুণ।'

পটলবাবু চুপ মেরে গেলেন।

ওরা ক ভাই-বোন?

জাল নোটে ক্ষতি

শ্রীচরণ পাদুকালয় বেশি দিনের দোকান নয়। কিন্তু দাম হাঁকে বেশি। তিরিশ টাকার বেশি হওয়া কোনো মতেই উচিত নয় এমন জুতোর দাম ওরা চল্লিশ টাকা চাইবেই। কাজেই দরদস্তুর করতে হয়। না করলেই ঠকা।

সেদিন সকালে দোকান খুলতেই এক ভদ্রলোক এসে দোকানে পায়ের ধুলো দিলেন। ভদ্রলোকের গায়ে দামী পোশাক, দেখেই মনে হয় বেশ পয়সাওলা।

খানিকক্ষণ এটা সেটা নেড়েচেড়ে ভদ্রলোক এক জোড়া কালো জুতো পছন্দ করলেন। দাম জিগ্যেস করতেই দোকানী জানালো— যাট টাকা। কেনা দাম অবিশ্যি চল্লিশ টাকা।

না, কোনো দরদস্তুর নয়। ভদ্রলোক চট করে পকেট থেকে একশো টাকার একখানা নোট বার করে দোকানীর দিকে এগিয়ে দিয়ে জুতো জোড়া বগলদাবা করলেন।

সবে দোকান খুলেছে, শ্রীচরণ পাদুকালয়ে একশো টাকার ভাঙ্গনী নেই। নোট ভাঙ্গাতে দোকানী তাই ছুটলো রাস্তার ওপরে অঙ্গবাস বস্ত্রালয়ে।

নোট ভাঙ্গিয়ে ষাট টাকা রেখে দোকানী চল্লিশটা টাকা ফেরত দিয়ে দিল ভদ্রলোককে। ভদ্রলোক রাস্তার ভিড়ে মিশে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে অঙ্গবাস বস্ত্রালয়ের ক্যাশিয়ারবাবু হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। হাতে একশো টাকার সেই নোটখানা। ক্যাশিয়ারবাবু বললেন নোটখানা জাল।

শুনেই দোকানীর মাথায় হাত। কী সর্বনাশ! লোকটা শেষে কিনা জাল নোট গছিয়ে দিয়ে গেল! দোকানী করুণ চোখে একবার নোটখানা উল্টেপাল্টে দেখল। সত্যিই নোটটা জাল।

কী আর করা যায়, বস্ত্রালয়কে গুনে গুনে একশোটি টাকা দিয়ে দিতে হলো। টাকা নিয়ে ক্যাশিয়ারবাবু চলে গেলেন।

জুতোও গেল, টাকাও গেল। শ্রীচরণ পাদুকালয়ের তাহলে কতো ক্ষতি হলো?

পারিবারিক মিলন

সেনবাড়িতে আজকে যেন উৎসব। না না বিয়ে, অন্নপ্রাশন এসব কিছু নয়। অনেকদিন পর সবাই একত্র হয়েছে তাই একটু হৈ-চৈ ফুর্তি। ভালোমন্দ খাওয়া দাওয়ার পর চলল গল্পগুজব, মাঝে, মাঝে গান।

পাশের বাড়ির একজন সেনবাড়ির ঝিকে পরদিন জিগ্যেস করল, 'হ্যাঁগা, কাল বুঝি তোমাদের বাড়ি অনেক লোক এসেছিল?

'হ্যাঁ গো ঠিকই বলেছো, মেলাই লোক হয়েছিল কালকে।' ঝি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

'তা কে কে এয়েছিল শুনি।'

গালে হাত দিয়ে ঝি আঙুল গুনে বলতে লাগল, 'এই ধরো গিয়ে একজন ঠাকুরদাদা, একজন ঠাকুরমা. দুজন বাবা, দুজন মা, চার

ছেলে-মেলে, তিন নাতি-নাতনি, এক ভাই, দুই বোন, একজন শ্বশুর, একজন শাশুড়ি, দুই ছেলে, দুই মেয়ে, আর হলো গিয়ে এক বৌমা। এতগুলো লোক কাল একসঙ্গে জড়ো হয়েছেল।'



সেন বাড়ির ঝিকে পরের দিন জিজ্ঞাসা করল

'ওমা, তাহলে তো অনেক লোক।'

'তা বটে। মোটমাট সাতজন।'

'সাতজন মানে? কী বলছো?'

ঝি ঠিকই বলেছে। মোট সাতজন। কিন্তু কীভাবে?

কে প্রথম?

বোটে করে নদীতে গল্পগুজব করতে করতে চলেছে তিন বন্ধু। শর্মা, ট্যাণ্ডন আর মিশ্র।

নদীর দুপাশে গাছপালা আর নানারকম দৃশ্য দেখতে দেখতে তিন বন্ধু এগিয়ে চলেছে। জায়গাটা মন্দ নয়। লোকজনের বাস তেমন একটা নেই এদিকটায়। শিকার-টিকার করতে কেউ কেউ নাকি আসে এদিকে।

ওরা তিন বন্ধু অবশ্যি শিকার-টিকার করতে আসেনি। এসেছে শুধুই বেড়াতে। তিনজনেই গল্পে মেতে আছে।

এক সময় শর্মা চুপ করে গেল। একটু অন্যমনস্কের মতো বলল, 'একটু আগে গুলির আওয়াজ শুনলাম যেন! মনে হলো কিছু দূরে কেউ গুলি ছুঁড়েছে!'

ট্যাণ্ডন বলল, 'আমি কিন্তু আওয়াজ-টাওয়াজ শুনিনি, তবে দূরে এক জায়গায় হঠাৎ কিছু ধোঁয়া উঠতে দেখলাম। ধোঁয়া দেখে আমারও মনে হলো কেউ গুলি ছুঁড়েছে বোধ হয়।'

ট্যাণ্ডনের কথা শেষ হতেই মিশ্র বলল, 'আমি আওয়াজও শুনিনি আর ধোঁয়াও দেখিনি তবে একটু আগে সামনে জলের মধ্যে ঝপাং করে কী একটা পড়তে দেখলাম। দেখেই মনে হলো কেউ নিশ্চয়ই গুলি ছুঁড়েছে। যাই বলো ভাই, জায়গাটা ভালো মনে হচ্ছে না। আর বেড়িয়ে কাজ নেই, ফিরে যাওয়া যাক।'

মিশ্রর প্রস্তাবে শর্মা আর ট্যাণ্ডন রাজি হয়ে গেল। ওরা সবাই ফিরে চলল।

ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই ঃ শর্মা শুধু গুলির আওয়াজ শুনেছে, ট্যাণ্ডন শুধুই ধোঁয়া দেখেছে আর মিশ্র শুধু গুলিটা জলের মধ্যে পড়তে দেখেছে। তাহলে তিনজনের মধ্যে কে প্রথম গুলি ছোঁড়ার ব্যাপারটা জানতে পারল?

প্রার্থী বাছাই

বিজ্ঞাপনটা বেরোতেই শয়ে শয়ে দরখাস্ত জমা পড়ল। চাকরির যা বাজার! কোথাও চাকরির একটা খোঁজ পেলেই দলে দলে চাকরি প্রার্থীরা যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

এতো দরখাস্ত, তা চাকরি তো মোটে চারটে। শ'য়ে শ'য়ে দরখাস্তের মধ্য থেকে চারজনকে বাছাই করতে হবে।

দরখাস্তগুলো দেখে প্রথমে মোটামুটিভাবে কয়েকজনকে বাছাই করা হলো। তারপর তাদের ডাকা হলো ইণ্টারভিউতে। ইণ্টারভিউতে নানারকম প্রশ্ন জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করে শেষমেষ চারজনকে বাছাই করা হলো চাকরির জন্যে।

বাছাই তো হলো। কিন্তু মাইনে? বিজ্ঞাপনে মাইনের উল্লেখ ছিল না, তবে এটা বলা ছিল, মাইনের ব্যাপারটা যোগ্যতা অভিজ্ঞতা এইসব দেখে আলাপ আলোচনা করে ঠিক করা হবে।

তা সব কিছু দেখেটেখে কর্তৃপক্ষ বছরে ছ হাজার টাকা মাইনের প্রস্তাব রাখলেন। টাকাটা দেয়া হবে প্রতি ছ মাস অন্তর, তিন হাজার টাকা করে। কর্তৃপক্ষ আরো বললেন কাজ দেখে সন্তুষ্ট হলে তারা মাইনে বাড়াবেন। মাইনে বাড়ানোটা দুরকমভাবে হতে পারে। এক, প্রতি এক বছর অন্তর তিনশো টাকা করে, দুই, প্রতি ছ মাস অন্তর একশো টাকা করে। যার যেটা সুবিধে।

চারজনের মধ্যে তিনজনই প্রথমটাতে রাজি হলো। বাকি একজনই শুধু দ্বিতীয় প্রস্তাবে রাজি হলো। কর্তৃপক্ষ কিন্তু এই লোকটিকেই ঐ তিনজনের ওপরওয়ালা হিসেবে নিয়োগ করলেন।

কিন্তু কেন?

দস্তানার সমস্যা

আমাদের বঙ্কুখুড়ো বড্ডো শীতকাতুরে। একটু শীত পড়লেই আর কথা নেই, চাদর সোয়েটার আর টুপিতে ঢেকে ফেলেন আপাদমস্তক। বাইরে যখন বেরোন নাক মুখটুকুই শুধু খোলা থাকে। সে এক দৃশ্য। বঙ্কু খুড়ো বললেন, শীতের সময় নানা আপদ, সর্দি কাশি আরো কতো কী। এসব হলে ঝকমারি কতো! তাই একটু সাবধানে চলাফেরা করাই ভালো।

সেদিন বিকেলে বঙ্কুবাবু সেজেগুজে বেরুবার জন্যে তৈরী হয়েছেন, দরজার কাছে গিয়ে খেয়াল হলো, এই যাঃ, হাতে দস্তানা তো পরা হয়নি। বাইরে যা শীত, দস্তানা না পরলে শীতে হাত বুঝি জমেই যাবে।

দস্তনা রয়েছে টেবিলের ড্রয়ারে। দুইরকম রংয়ের গোটাকতক দস্তানা আছে ড্রয়ারে। লাল আর সাদা।

দস্তানা নেবার জন্যে বঙ্কুবাবু যেই টেবিলের দিকে এগিয়েছেন

অমনি ঝুপ করে আলো নিবে গেল। লোডশেডিং। চারদিকে ঘুট-ঘুটে অন্ধকার। হাতের কাছে দেশলাই বা টর্চও নেই যে আলো জ্বালিয়ে দেখবেন। হাতড়ে হাতড়ে কোনোমতে ড্রয়ারটা অবিশ্যি খুললেন শেষ পর্যন্ত। কিন্তু দস্তানা তুলতে গিয়ে ভাবনায় পড়লেন। দস্তানা লাগবে তো দু হাতের জন্যে দুটো, কিন্তু আন্দাজে যে দুটো তুলবেন সে দুটো যদি দু'রকম রংয়ের হয়? একটা লাল, আর একটা সাদা, দু হাতে দু রংয়ের দস্তানা, সে তো বিচ্ছিরি ব্যাপার। আর আন্দাজে তোলা ছাড়া উপায়ই বা কি! আলো আসবে সেই কখন, ততোক্ষণ তো আর বসে থাকা যায় না। ড্রয়ারের সব দস্তানা অবিশ্যি তুলে নেয়া যায়, তাহলে ওর মধ্য থেকে এক রংয়ের দুটো পাওয়া যাবেই। বাইরে মোমবাতির আলোয় দেখে নিতে হবে। কিন্তু অতগুলো দস্তানা বয়ে বেড়ানোও তো এক ঝামেলা।

কিন্তু সব দস্তানা তুলবার দরকারই বা কী? গুটিকয়েক তুললেই তো হয়।

প্রশ্ন হলো, সব চাইতে কম কতগুলো দস্তানা তুললে নিশ্চিত হওয়া যায় যে তার মধ্যে একই রংয়ের দুটো দস্তানা থাকবেই।

ধাঁধার উত্তর

নৌকো পারাপারের সমস্যা

এটা স্রেফ বুদ্ধির ধাঁধা। একটু বুদ্ধি খাটালেই সমস্যার সমাধান করা যায় এখানে।

প্রথমে রামু আর দামু নৌকায় করে ওপার যাবে। ওরা দুজন একসঙ্গে চাপলে তো আর নৌকো ডুববে না। ওপার গিয়ে যে কোনো একজন, ধরা যাক রামু, থেকে যাবে। আর দামু নৌকা নিয়ে এপারে ফেরত চলে আসবে। তারপর? তারপর ছোটমামা উঠবে নৌকোয়। দামু অবশ্যই ছোটমামা উঠবার আগেই নৌকো থেকে পাড়ে নেমে যাবে, কারণ ছোটমামা আর দামু একসঙ্গে নৌকোয়

থাকলে নৌকো ডুববে। ছোটমামা একা নৌকো চালিয়ে ওপারে গিয়ে নামবে। এইবার রামু নৌকো নিয়ে এপারে এসে এপার থেকে দামুকে তুলে নিয়ে দুজনে একসঙ্গে ওপার যাবে। তাহলেই তিন-জনের ওপার যাওয়া হলো।

নৌকো পারাপারের আর এক সমস্যা

আবদুল ছাগলছানাকে সঙ্গে নিয়ে চটপট এপারে চলে এলো। ওপারে রয়ে গেল পোষা কুকুর আর তরকারির আঁটি। যদি ছাগল-ছানার বদলে কুকুরকে প্রথমে সঙ্গে আনত, আর ওপারে রেখে আসত তরকারি আর ছাগলছানাকে তাহলে ছাগলছানা তরকারি সাবাড় করতো।

এপারে এসে ছাগলছানাটিকে রেখেই আবার ওপার চলে গেল। ওপার থেকে তরকারির আঁটি নিয়ে এপারে রাখল। তরকারি রেখে ছাগলছানাটিকে ফের নিয়ে গেল ওপারে, কারণ তরকারির কাছে ছাগল-ছানাকে বিনা পাহারায় রাখা যায় না। ওপারে গিয়ে ছাগলছানাকে রেখে কুকুরটিকে নিয়ে গেল এপারে। কুকুরকে এপারে রেখে ফের ওপার গেল ছাগলছানাকে আনতে। ছাগলছানাকে নিয়ে এপারে এসে এক হাতে কুকুর আর এক হাতে ছাগলছানাকে ধরে তরকারির আঁটি মাথায় চাপিয়ে আবদুল বাড়ির পথে চলল।

ডিম বিক্রি

মোট একত্রিশটা ডিম নিয়ে নফর হাটে গিয়েছিল।

একত্রিশের অর্ধেক হয় সাড়ে পনেরো। তার সঙ্গে একটা ডিমের অর্ধেক যোগ করার মানে সেই ষোলোটা ডিম। তাহলে প্রথমজন কিনল ষোলোটা ডিম। ডিম ভাঙ্গাভাঙ্গির কোনো দরকারই নেই।

একত্রিশের থেকে ষোলোটা গেল। বাকি রইল পনেরোটা ডিম। পনেরোর অর্ধেক সাড়ে সাত। এর সঙ্গে একটা ডিমের অর্ধেক যোগ করা মানে পুরোপুরি আটটা ডিম। তাহলে দ্বিতীয় জন কিনল আটটা ডিম। ভাঙ্গাভাঙ্গি না করেই।

প্রথম আর দ্বিতীয়জন কেনার পর বাকি রইল সাতটা ডিম। সাতের অর্ধেক সাড়ে তিন, এর সঙ্গে আরো অর্ধেক যোগ করলে হয় চার। তার মানে তৃতীয়জনকে বেচল চারটে ডিম।

সাতের থেকে চার গেলে বাকি রইল তিনটে ডিম। ঐ তিনটে ডিম নফর বাড়ি নিয়ে চলল খাবে বলে।

পল্টুর লেমনেড খাওয়া

দোকানীর কথাই ঠিক।

শুধু বোতলের দাম পঞ্চাশ পয়সা নয়। পঁচিশ পয়সা।

আসলে খালি বোতলের দামের সঙ্গে দেড় টাকা যোগ করলে সেটা হয় বোতল বাদে শুধু লেমনেডের দাম। এর সঙ্গে বোতলের দাম জুড়লে তবেই তা দু টাকার সমান হবে। তার মানে, খালি বোতলের দাম দুবার ধরে তার সঙ্গে দেড় টাকা যোগ করলে তা দু টাকার সমান হচ্ছে। তাহলে দু টাকা বিয়োগ দেড় টাকা, মানে পঞ্চাশ পয়সার মধ্যে খালি বোতলের দাম দুবার ধরা আছে। সেজন্য খালি বোতলের দাম হবে পঞ্চাশ পয়সার অর্ধেক, মানে পঁচিশ পয়সা।

[যারা বীজগণিত জানে, তারা সমীকরণের সাহায্যে এটা চট করে বার করতে পারবে। খালি বোতলের দাম 'ক' হলে এখানে ক+(ক+১·৫০)=২·০০ এ থেকে বেরোয়, ২ক=৫০ পয়সা, কাজেই ক=২৫ পয়সা।]

খুচরো পয়সার সমস্যা

বরেনবাবু, টিকিটবাবু আর ঐ ভদ্রলোকের কাছে যা আছে সব একত্র করলে পাওয়া যাচ্ছে একটা এক টাকার নোট, একটা পঞ্চাশ, একটা পঁচিশ, দুটো দশ, একটা পাঁচ, একটা তিন, দুটো দুই, একটা এক পয়সা—মোট দুশো আট পয়সা। এ থেকে টিকিটবাবু নেবেন তাঁর নিজের পঁচাত্তর পয়সা আর টিকিটের দাম চৌত্রিশ পয়সা, মোট এই একশো নয় পয়সা। বরেনবাবুর কাছে প্রথমে ছিল এক টাকা

পাঁচ পয়সা, টিকিটের দাম বাদ দিয়ে তিনি নেবেন একাত্তর পয়সা। আর ভদ্রলোক নেবেন তাঁর আঠাশ পয়সা।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে এক টাকার নোটটা নেবেন টিকিটবাবু, আধুলি নেবেন বরেনবাবু, আর সিকিটা নেবেন ভদ্রলোক। টিকিট-বাবু পাবেন আরো নয় পয়সা আর ঐ ভদ্রলোক তিন পয়সা।

দশ পয়সা দুটো অনায়াসে বরেনবাবুকে দিয়ে দেয়া যায়। তাহলে বাকি পড়ে রইল একটা পাঁচ, একটা তিন, দুটো দুই, একটা এক। এ থেকে টিকিটবাবু নেবেন পাঁচ, আর দুটো দুই, ভদ্রলোক তিন, আর বাকি এক পয়সা বরেনবাবু।

তাহলে পয়সাগুলো ভাগ হলো কী ভাবে? ভাগ হলো এইভাবে—টিকিটবাবু এক টাকার নোট, পাঁচ আর দুটো দু পয়সা। বরেনবাবু আধুলি, দুটো দশ, আর এক পয়সা। ভদ্রলোক সিকি আর তিন পয়সা।

সমস্যার সমাধান হলো তো? টিকিটবাবুই কিন্তু মাথা খাটিয়ে এই সমাধান বার করলেন! না হলে বরেনবাবুর টিকিট পেতে আরো দেরি হতো।

ওজনের কায়দা

কী, কায়দাটা ধরতে পারেনি? খুবই সোজা কিন্তু।

ধরো দু কিলো চিনি ওজন করতে হবে। দাঁড়ি পাল্লার একদিকে তিন কিলো আর একদিকে এক কিলো ওজনের পাথর চাপিয়ে এক কিলোর দিকের পাল্লায় চিনি ঢেলে দুদিক মেলালে সেই চিনির ওজন কতো হবে? নিশ্চয়ই দু কিলো। দু কিলো চিনি এইভাবেই মাপা যায়।

ঠিক এই কায়দায় ৯ কিলো আর ৩ কিলে ওজনের পাথরের সাহায্যে ৬ কিলো চিনি বা অন্য কিছু মাপা যায়।

কিন্তু পাঁচ কিলো?

শিউমঙ্গল করে কি, বাঁ দিকে ৯ কিলো আর ডানদিকে ৩ আর ১

কিলো ওজনের পাথর চাপায়। তারপর ডানদিকে ডাল, চাল বা চিনি ঢেলে ছদিক মেলায়। তাহলে ডানদিকের ডাল, চাল বা চিনির ওজন হলো পাঁচ কিলো।

ঠিক এইভাবেই সাত কিলো মাপা যায়। সাত কিলো মাপতে একদিকে চাপাতে হবে ৯ আর ১ কিলো, আর একদিকে চাপাতে হবে ৩ কিলো ওজনের পাথর।

চল্লিশ কিলো অব্দি জিনিস ঐ চারটে পাথর দিয়ে মেপে দেয় শিউমঙ্গল। স্রেফ, যোগ, বিয়োগ করে।

[৭=(৯+১)—৩ ; ৮=৯—১ ; ১১= (৯+৩)—১; ১৪= ২৭—(৯+৩+১) ; ১৫=২৭—(৯+৩) ; ১৬=(২৭+১)— (৯+৩) ;]

ভাই-বোন

মিলু বলেছে, ওর যতো বোন ততো ভাই। মিলু এটা বলেছে নিজেকে বাদ দিয়ে। তাহলে মিলুকে ধরলে দাঁড়াচ্ছে এই, ওরা বোন যতোজন ভাই তার চাইতে একজন বেশি।

আবার ঝুমার কথামতো দাঁড়াচ্ছে এই, ঝুমাকে বাদ দিয়ে যতো বোন, ভাই তার দ্বিগুণ।

তাহলে এমন ছটো সংখ্যা বাছতে হবে যার প্রথম থেকে ১ বিয়োগ করলে দ্বিতীয়টার সমান হয়। আবার দ্বিতীয়টা থেকে ১ বিয়োগ করলে প্রথমটার অর্ধেক হয়।

একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায়, প্রথম সংখ্যাটা হবে ৪ আর দ্বিতীয়টা ৩ ; তাহলে মিলুরা চার ভাই, তিন বোন।

জাল নোটে ক্ষতি

যেহেতু বস্ত্রালয়ের একশো টাকা ফেরত দিয়ে দিতে হলো, আবার জুতোজোড়াও গেল সেজন্যে চট করে মনে হতে পারে, শ্রীচরণ পাছকালয়ের মোট ক্ষতি একশো ষাট টাকা, জুতোর দামসমেত। আসলে কিন্তু মোট ক্ষতি ঐ একশো টাকাই।

জাল নোট, যার কোনো দামই নেই, তার বিনিময়ে পাদুকালয়ের মালিক বস্ত্রালয় থেকে একশো টাকা নিয়ে এল। তা থেকে জুতোর দাম ষাট টাকা রেখে দিয়ে চল্লিশ টাকা খরিদ্দারকে দিয়ে দিল।

এবার বস্ত্রালয়কে টাকা ফেরত দেবার পালা। দিতে হবে একশো টাকা। পাদুকালয়ের দোকানীর হাতে ষাট টাকা (যেটা আসলে বস্ত্রালয়েরই টাকা) তো রয়েছেই, তার সঙ্গে জুড়তে হবে নিজের চল্লিশ টাকা। ঐ চল্লিশ টাকাই ক্ষতি। আর ক্ষতি জুতো জোড়া, যার দান ষাট টাকা। তাহলে মোট ক্ষতি কতো দাঁড়াল ? চল্লিশ আর ষাট—মোট একশো টাকা।

পারিবারিক মিলন

এক ভাই, দুই বোন, তাদের বাবা-মা ঠাকুর্দা-ঠাকুমা—মোট এই সাতজন।

দুজন বাবা বলতে ঝি বোঝাতে চেয়েছে, ছেলেমেয়ে তিনটির বাবা, আর তার বাবা। দুজন মা বলতেও তাই।

ছেলেমেয়ে তিনটির বাবা, যিনি ঠাকুর্দার ছেলে, আর ওরা নিজেরা —এই হলো চার ছেলেমেয়ে।

এইভাবে অন্যান্য সম্পর্কগুলোও মিলিয়ে দেখা যায়।

কে প্রথম ?

বন্দুক থেকে গুলি ছোড়া হলে দূর থেকে প্রথমে ধোঁয়া দেখা যায়, তারপর গুলি, সব শেষে শোনা যায় আওয়াজ।

ট্যাণ্ডন ধোঁয়া দেখেছে, সে-ই প্রথম গুলির ব্যাপারটা জেনেছে। তারপর জেনেছে মিশ্র, কারণ সে গুলি দেখেছে। শর্মা শুধু আওয়াজ শুনেছে, কাজেই সে সবশেষে জেনেছে।

প্রার্থী বাছাই

ছ মাসে একশো টাকা মানে বছরে দুশো টাকা। দুশোর চাইতে তিনশো বেশি, সেই হিসেবে মনে হতে পারে প্রথম প্রস্তাবই ভালো। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কী ?

মাইনে বাড়াবার পর প্রথম প্রস্তাব অনুযায়ী বছরে মাইনে হয় প্রথম বছরের শেষে ৬৩০০ টাকা, দ্বিতীয় বছরের শেষে ৬৬০০ টাকা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব অনুযায়ী ছ মাস শেষে ৩১০০, আরো ছমাস বাদে ৩২০০, মানে প্রথম বছরের শেষে ৬৩০০ টাকা। এরপর ছ মাস বাদে ৩৩০০,আরো ছ মাস বাদে ৩৪০০, মানে দ্বিতীয় বছরের শেষে বাৎসরিক মাইনে দাঁড়াচ্ছে ৬৭০০ টাকা।

দেখা যাচ্ছে, তৃতীয় বছর থেকেই বাৎসরিক মাইনে প্রথম প্রস্তাব অনুযায়ী যা, দ্বিতীয় প্রস্তাব অনুযায়ী তার বেশি হচ্ছে। পরের বছরগুলোতে আরো বেশি হবে। একমাত্র সেই প্রার্থীটিই এটা ধরতে পেরেছিল।

কর্তৃপক্ষ বুঝতে পেরেছিলেন, অন্য তিনজনের তুলনায় এ বেশি বুদ্ধিমান। ঐ তিনজনের ওপরওয়ালা হবার যোগ্যতা এর আছে।

দস্তানার সমস্যা

তিনটে। তিনটে দস্তানা তুললেই যথেষ্ট।

তিনটের মধ্যে ছুটো দস্তানা একই রংয়ের পাওয়া যাবেই। কারণ আন্দাজে তোলা তিনটে দস্তানার রং একই রকম হতে পারে :

তিনটেই লাল, তিনটেই সাদা, ছুটো লাল একটা সাদা, একটা লাল ছুটো সাদা।

এছাড়া আর কোনো সম্ভাবনা থাকতে পারে না।

ছকে বেঁধে গুণ

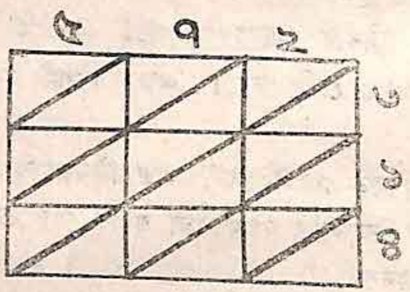
দীপু বলছিল ওর গুণ করতে একদম ভালো লাগে না। গুণ, বিশেষ করে বড়ো বড়ো গুণ ভাগ করার কথা মনে হলেই ওর গায়ে জ্বর এসে যায়। অথচ অংক করতে গেলে গুণ-ভাগ করতেই হয় ইস্, যদি গুন জিনিসটা অংকের মধ্যে না থাকত, কী ভালোই না হতো!

রাঙাদা বলল, গুণ করার একটা মজার নিয়ম আছে। ছক কেটে

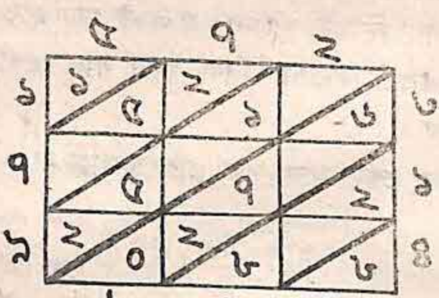
তার মধ্যে গুণ। নিয়মটা মজার তো বটেই তাছাড়া এতে ভুল হবার সম্ভাবনা কম থাকে।

দীপু শুনেই এক ছুটে চলে গেল গৌতমকে ডেকে আনতে। একটু পরেই ও গৌতমকে সঙ্গে নিয়ে এল, হাতে ওর কাগজ পেন্সিল।

রাঙাদা বলল, 'ধর, ৫৭২ কে ৩২৪ দিয়ে গুণ করতে হবে। প্রথমেই ছ্যাখ, ৫৭২ আর ৩২৪ এই ছুটো সংখ্যাতেই তিনটে করে অংক আছে। তাই তিনটে স্তম্ভ আর তিনটে সারি নিয়ে মোট



(ক)



(খ)

ন'টা খোপ-অলা ছক কাটলাম (ক), তারপর ৫৭২-কে ছকের একেবারে ওপরে—প্রথম স্তম্ভের মাথায় ৫, দ্বিতীয় স্তম্ভের মাথায় ৭, তৃতীয় স্তম্ভের মাথায় ২, এইভাবে লিখলাম। আর ৩১৪কে লিখলাম

ছকের একেবারে ডানদিকে লম্বালম্বিভাবে—প্রথম সরির কাছে ৩ দ্বিতীয় সারির কাছে ১, তৃতীয় সারির কাছে ৪, এইভাবে। তারপর প্রত্যেকটা খোপকে কোণাকুণি লাইন কেটে ছুভাগে ভাগ করে ফেললাম।

দীপু আর গৌতম দুজনেই ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল—

রাঙাদা বলল, 'এভাবে কোণাকুণি লাইন টানার ফলে পুরো ছকটার মধ্যে তেরচাভাবে কয়েকটা রাস্তামতো তৈরী হলো। এইবার গুণ করার পালা। গুণ করতে হবে একটা একটা সারি ধরে। প্রথম সারিটাই ধর প্রথমে (খ)। প্রথম সারির কাছে ৩ আছে। ঐ ৩ দিয়ে ছকেই ওপরকার ৫, ৭, ২ আলাদা আলাদাভাবে গুণ করতে হবে। ৩ দিয়ে ৫ কে গুণ করলে হয় ১৫, এই ১৫ কে প্রথম সারিতে লেখা হলো ৫-এর ঠিক নিচেকার খোপে। ১৫র ১ কে বসানো হলো কোণাকুণি লাইনের ওপরে আর ৫ কে বসানো হলো নিচে। ঠিক এইভাবে ৭-এর নিচেকার খোপে বসানো হলো ২১, কারণ ৩ দিয়ে ৭ কে গুণ করলে হয় ২১। আবার ৩ × ২ = ৬, তাই ৬ কে বসানো হলো ২-এর নিচেকার খোপে। ৬ সংখ্যাটা এক অংকের বলে সেটা কোণাকুণি লাইনের নিচের দিকে বসানো হলো।

দ্বিতীয় সারির বেলায়ও এইরকম। দ্বিতীয় সারির ডানদিককার ১-এর সঙ্গে ছকের একেবারে মাথার দিককার ৫, ৭, ২-এর গুণফল-গুলো ঐ সারিতে পরপর খোপে বসানো হলো। তৃতীয় সারির বেলাতেও তাই।

এইবার যোগ। যোগ করতে হবে ছকের নিচে ডনেদিক থেমে। ছকের নিচে একেবারে ডানদিকে ৮ বসবে কারণ তৃতীয় সারির একেবারে ডানদিকে ৪-এর কাছ থেকে যে তেরচা রাস্তা নিচের দিকে নেমেছে তাতে ঐ একটি মাত্র সংখ্যা ৮ আছে। এর ঠিক ওপর—কার রাস্তা, মানে দ্বিতীয় সারির একেবারে ডানদিকে ১, এর কাছ থেকে যে তেরচা রাস্তা নিচের দিকে নেমেছে তাতে ২ আর ৮

এই দুটো সংখ্যা আছে। এদের যোগফল ১০। দশের ০ বসল ঐ রাস্তার শেষে, হাতে ১ রইল। ঐ ১ আবার পরের রাস্তায় যে চারটে সংখ্যা (৬, ৭, ২, ০) আছে তাদের সঙ্গে যোগ হলো। যোগফল হলো ১৬, এর ৬ বসল ঐ রাস্তার শেষে, ১ হাতে রইল। এইভাবে চলবে।

প্রথম রাস্তা : ৮

দ্বিতীয় রাস্তা : ২+৮=১০, ০ বসল, ১ হাতে রইল।

তৃতীয় রাস্তা : ৬+৭+২+০+ হাতের ১=১৬, ৬ বসল ১ হাতে রইল।

চতুর্থ রাস্তা: ১+৫+২+হাতের ১=৯

পঞ্চম রাস্তা : ২+৫=৭

ষষ্ঠ রাস্তা : ১

রাঙাদা একটু থেমে দীপুর দিকে তাকাল, 'তাহলে গুণফল কোন্‌টা হলো ?'

দীপু আগেই এক ফাঁকে ৫৭২ কে ৩১৪ দিয়ে আলাদা একটা কাগজে গুণ করে রেখেছিল। অবশ্যই সাধারণ নিয়মে। ও ছকের সঙ্গে ওর করা গুণফলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখল। ঠিক ১৭৯৬০৮ই হচ্ছে তার মানে ছকের বাঁ দিকে ওপর থেকে আরম্ভ করে ছকের নিচ বরাবর একেবারে ডানদিক অব্দি পরপব অংকগুলো সাজালেই গুণফল পাওয়া যায়।

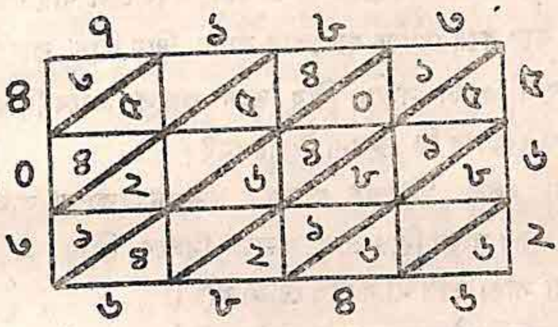
দীপু বলল, 'গুণফল হলো ১৭৯৬০৮'।

রাঙাদা কী বলতে যাচ্ছিল, দীপু রাঙাদাকে থামিয়ে দিয়ে বলল 'দাঁড়াও দাঁড়াও এবার আমি একটা গুণ করে দেখি।'

ওদিকে গৌতমও কাগজ পেন্সিল নিয়ে রেডি। ও—ও একটা গুণ করে নিয়মটা যাচাই করবে।

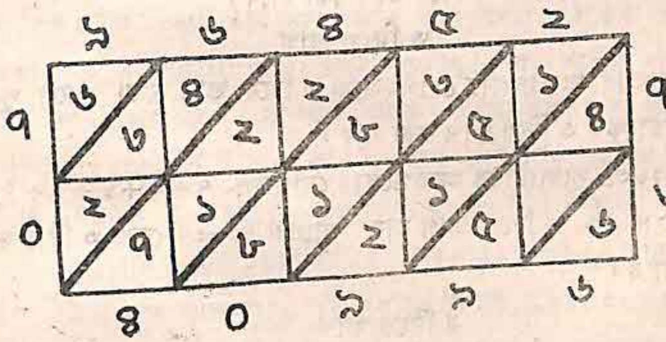
দীপু ৭১৮৩-কে ৫৬২ দিয়ে আর গৌতম ৯৬৪৫২-কে ৭৩ দিয়ে গুণ করল এই নতুন নিয়মে—

সাধারণ নিয়মে গুণ করে সেই গুণফলের সঙ্গে এই নতুন নিয়মে পাওয়া গুণফল ওরা মিলিয়ে দেখল। গুণফল মিলে গেছে। ওরা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।



গুণফল : ৪০৩৬৮৪৬

দীপু একটা জিনিস লক্ষ্য করল। এক একটা সারি ধরে গুণ করার সময় সারির ডানদিক কি বাঁ দিক--যে কোনো একদিক থেকে শুরু করলে চলে। শেষমেষ ব্যাপারটা একই দাঁড়ায়।



গুণফল : ৭০৪০৯৯৬

রাঙাদা বলল, 'এই নিয়মে গুণ করতে রুল টানা কাগজেই সুবিধে, ছকটা তাড়াতাড়ি কাটা যায়। আরো সুবিধে খোপ কাটা কাগজ নিলে।'

ভাগের আগে

দীপু বলছিল বড়ো বড়ো সংখ্যাগুলো ভগ্নাংশে কাটাকুটি করতে ওর বড্ডো সময় লাগে। কী দিয়ে কাটবে, মানে কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ যাবে সেটা ঠিক করতেই অনেকটা সময় চলে যায়। এক এক করে ভাগ করে করে দেখতে হয় কোন্ সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মেলে। কিন্তু কোনো একটা সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মিলবে কিনা তা এক নজরে দেখে বোঝার কি কোনো উপায় নেই?

রাঙাদা বলল, 'নিশ্চয়ই আছে। বিরাট কোনো সংখ্যাকে দুই তিন, চার এসব সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মিলবে কিনা তা ঐ সংখ্যা টাকে সত্যি সত্যি ভাগ না করেও বোঝা যায়।

দীপু আর গৌতম দুজনেই কৌতূহলী হলো। রাঙাদা কাগজ পেন্সিল নিয়ে 'বোঝাতে আরম্ভ করল, ওরা ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল।

২ দিয়ে ভাগ

কোনো সংখ্যার একেবারে ডান দিকের অংকটা জোড় হলে কিংবা শূন্য হলে সংখ্যাটাকে ২ দিয়ে ভাগ করা যাবে।

৩ দিয়ে ভাগ

সংখ্যার অংকগুলোর যোগফলকে ৩ দিয়ে ভাগ করা গেলে পুরো সংখ্যাটাকেও ৩ দিয়ে ভাগ করা যায়।

৭২৮৩৪ সংখ্যাটাতে অংকগুলোর যোগফল ৭+২+৮+৩+৪= ২৪, ২৪ কে ৩ দিয়ে ভাগ যায়, কাজেই ৭২৮৩৪-কেও ৩ দিয়ে ভাগ করা যাবে।

৪ দিয়ে ভাগ

যে সংখ্যাটাকে ভাগ করতে চাই তার ডানদিকের প্রথম দুটো অংক এক সাথে নিয়ে তাকে ৪ দিয়ে ভাগ করা গেলে গোটা সংখ্যাটাকেই ৪ দিয়ে ভাগ করলে মিলবে।

৯২৩৪:৩৬-এর কথাই ধরা যাক। ডান দিকের প্রথম দুটো অংক

নিলে হয় ৩৬, একে ৪ দিয়ে ভাগ করলে মেলে, কাজেই গোটা সংখ্যা-টাকে ৪ দিয়ে ভাগ করলে মিলবে।

৫ দিয়ে ভাগ

কোনো সংখ্যার ডান দিকের শেষ অংকটা যদি ০ কিংবা ৫ হয় তাহলে সংখ্যাটাকে ৫ দিয়ে ভাগ করলে মিলবে।

৩১২৫, ৭২৮১৪০ এইসব সংখ্যাকে ৫ দিয়ে ভাগ যাবে।

৬ দিয়ে ভাগ

সংখ্যাটা যদি জোড়া হয় (ডান দিকের প্রথম অংকটা জোড় হলে সংখ্যাটাও জোড় হয়) আর অংকগুলোর যোগফলকে যদি ৩ দিয়ে ভাগ যায় তাহলে সংখ্যাটাকে ৬ দিয়ে ভাগ যাবে।

১৫৫১৭০৮ এর শেষ অংক ৮, এটা জোড়, কাজেই সংখ্যাটা জোড়। আবার সংখ্যাটার অংকগুলোর যোগফল ২৭, এটা ৩ দিয়ে বিভাজ্য। কাজেই সংখ্যাটা ৬ দিয়ে বিভাজ্য।

৭ দিয়ে ভাগ

এটাতে একটু সময় লাগতে পারে অন্যগুলোর চাইতে। প্রথমে ডান দিক থেকে তিনটে করে অংক ছেড়ে কমা বসাতে হবে। কমার মাঝখানে যে সংখ্যাগুলো তার প্রথম, তৃতীয় (পঞ্চম থাকলে পঞ্চম) সংখ্যা যোগ করে সেই যোগফল থেকে দ্বিতীয়, চতুর্থ (ষষ্ঠ থাকলে ষষ্ঠ) সংখ্যার যোগফল বিয়োগ করে যা হবে সেটা যদি শূন্য হয় কিংবা ৭ দিয়ে বিভাজ্য হয় তাহলে মূল সংখ্যাটাও ৭ দিয়ে বিভাজ্য হবে।

একটা বিরাট সংখ্যা নেওয়া যাক: ৪৪১৭৫০৭৪২৩। ডান দিক থেকে তিনটে করে অংক ছেড়ে কমা বসালে দাঁড়ায় ৪,৪১৭,৫০৭,৪২৩। প্রথম আর তৃতীয় সংখ্যা মানে ৪২৩ আর ৪১৭-র যোগফল ৮৪০ আবার দ্বিতীয় আর চতুর্থ সংখ্যা, মানে ৫০৭ আর ৪ এর যোগফল ৫১১; দুই যোগফলের বিয়োগফল ৮৪০—৫১১=৩২৯, এটাকে ৭ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায়, কাজেই যে-বিরাট সংখ্যাটা নেওয়া হয়েছে সেটা ৭ দিয়ে ভাগ করলে মিলবে।

আর একটু ছোট সংখ্যা নেয়া যাক, যেমন, ৪০৩৪১; খুব সোজা। ৩৪১—৪০=৩০১, আর ৩০১ যে ৭ দিয়ে বিভাজ্য সে-তো মুখে মুখেই ঠিক করা যায়। কাজেই ৪০৩৪১ সংখ্যাটি ৭ দিয়ে বিভাজ্য।

একটু অভ্যেস হয়ে গেলেই যোগ বিয়োগের ব্যাপারগুলো মুখে মুখেই করা যায়।

৮ দিয়ে ভাগ

সংখ্যার ডানদিকের শেষ তিনটে অংককে একসাথে ধরে যদি তাকে ৮ দিয়ে ভাগ যায় তাহলে সংখ্যাটাকেও ৮ দিয়ে ভাগ যাবে। না হলে যাবে না।

৭২৮৬৮৯৬-এর কথাই ধরা যাক। শেষ তিনটে অংক একসাথে নিলে ৮৯৬, মুখে মুখে করেই বোঝা যায়, একে ৮ দিয়ে ভাগ করলে মেলে, কাজেই পুরো সংখ্যাটাকে ৮ দিয়ে ভাগ করলে মিলবে।

৯ দিয়ে ভাগ

এটা খুব সোজা। কোন সংখ্যাকে ৯ দিগে ভাগ করলে মিলবে কিনা এক নজরে বুঝতে হলে সংখ্যার অংকগুলোকে যোগ করতে হবে। অংকগুলোর যোগফল যদি ৯ দিয়ে বিভাজ্য হয় তো সংখ্যাটাও ৯ দিয়ে বিভাজ্য হবে। না হলে হবে না।

ধরা যাক ১৪৬৭৫১৩; এই সংখ্যাটাকে ৯ দিয়ে ভাগ করলে মিলবে কারণ এর অংকগুলোর যোগফল ২৭-কে (১+৪+৬+৭+৫+১+৩=২৭) ৯ দিয়ে ভাগ করলে মেলে।

১০ দিয়ে ভাগ

এটা আরো সোজা। ডান দিকের শেষে ০ থাকলেই সংখ্যাটা ১০ দিয়ে বিভাজ্য। আর ঐ শূন্যটা কেটে দিলে যা থাকে সেটাই ভাগফল।

একটার জায়গায় দুটো শূন্য থাকলে ১০০ দিয়ে, তিনটে শূন্য থাকলে ১০০০ দিয়ে বিভাজ্য।

৬১৭২০ দশ দিয়ে, ৫৩৮২০০ একশো দিয়ে, ৭১৯৬০০০ এক হাজার দিয়ে বিভাজ্য।

১১ দিয়ে ভাগ

ডান কি বাঁ যে-কোনো একদিক থেকে আরম্ভ করে একটা করে ছেড়ে অংক নিয়ে সেগুলোর যোগফল আর বাকি অংকগুলো যা রইল সেগুলোরও যোগফল আলাদাভাবে বার করতে হবে। মুখে মুখেই বার করা যায়। এই দুই যোগফলের যা বিয়োগফল হবে সেটা যদি শূন্য হয় কিংবা ১১ দিয়ে বিভাজ্য হয় তো মূল সংখ্যাটাও ১১ দিয়ে বিভাজ্য হবে।

৫৬১৮০৩-এর বেলায় ৫,১,০-র যোগফল ৬; বাকি রইল ৬,৮,৩, এগুলোর যোগফল ১৭; এখন ১৭ আর ৬-এর বিয়োগফল ১১, এটা নিশ্চয়ই ১১ দিয়ে বিভাজ্য। কাজেই ৫৬১৮০৩ সংখ্যাটাও ১১ দিয়ে বিভাজ্য।

আরেকটা সংখ্যা নিই। ৪৫৭৯৩। ৩,৭,৪-এর যোগফল ১৪, বাকি রইল ৯,৫, এদের যোগফলও ১৪ ; দুই যোগফলের বিয়োগফল শূন্য। কাজেই মূল সংখ্যাটা ১১ দিয়ে বিভাজ্য।

১২ দিয়ে ভাগ

৩ আর ৪ এই দুটো দিয়েই বিভাজ্য হলে সংখ্যাটা ১২ দিয়ে বিভাজ্য হবে। একটা দিয়ে বিভাজ্য কিন্তু আরেকটা দিয়ে নয়, এরকম হলে কিন্তু হবে না।

১৩ দিয়ে ভাগ

যেভাবে ৭ দিয়ে বিভাজ্যতা বোঝা যায় সেই একইভাবে ১৩ দিয়ে বিভাজ্যতা বোঝা যায়।

৯৩১১২৫ এর বেলায় ডান দিক থেকে তিনটে অংক ছেড়ে কমা বসিয়ে ১২৫ আর ৯৩১ এই দুটো আলাদা সংখ্যায় ভেঙ্গে নেওয়া হলো এই দুয়ে বিয়োগফল ৮০৬, এটা ১৩ দিয়ে বিভাজ্য। কাজেই বোঝা গেল ৯৩১১২৫ সংখ্যাটা ১৩ দিয়ে বিভাজ্য।

ছ অংকের কোনো সংখ্যা যদি 'কখগ কখগ' ধরনের মানে প্রথম তিনটে অংক যা শেষের তিনটে অংকও তাই হয় তাহলে সেটা ৭ আর ১৩ দুটো দিয়েই বিভাজ্য হবে।

৮১১৮২১, ৫২৩৫২৩, ৩০৭৩০৭ সংখ্যাগুলো এই ধরনের। এগুলো ৭ দিয়ে বিভাজ্য, আবার ১৩ দিয়েও বিভাজ্য।

পাঁচ অংকের সংখ্যা যদি এমন হয় যে মধ্যের অংকটা শূন্য আর দুদিকের অংকগুলো একই রকম (যেমন ৩৭০৩৭) আর চার অংকের সংখ্যা যদি এমন হয় যে মধ্যিখানে দুটো শূন্য আর দুদিকে একই অংক (যেমন ৬০০৬) তাহলে সেটা ৭ আর ১৩ এই দুটো দিয়েই বিভাজ্য হবে।

না দেখে বইয়ের পৃষ্ঠা

রাঙাদা বলল যে কোন একটা বই আর একটা পেন্সিল নিয়ে আয়।

গৌতম চট করে টেবিল থেকে ওর ইতিহাস বইটা আর সেই সঙ্গে একটা পেন্সিল নিয়ে এল।

রাঙাদা আগের মতো পিছন ফিরে চোখ বন্ধ করে বলল, 'বইটার যে-কোনো পৃষ্ঠা খুলে সেই পৃষ্ঠার প্রথম দশ লাইনের মধ্যে যে-কোনো লাইনের কাছে ছোট্ট করে দাগ দে।'

দীপু চটপট গৌতমের হাত থেকে বইটা নিয়ে একটা পৃষ্ঠা খুলল তারপর পেন্সিলটা দিয়ে রাঙাদার কথামতো সেই পৃষ্ঠার প্রথম দশ লাইনের মধ্যে একটা লাইন বেছে নিয়ে তার পাশে দাগ দিল !

রাঙাদা জিজ্ঞেস করল 'হয়েছে।'

হয়েছে।'

'এবার যে-পৃষ্ঠা খুলেছিস সেই পৃষ্ঠার সংখ্যাকে দশগুণ করে তার সঙ্গে পঁচিশ যোগ দে।'

দীপু মনে মনে হিসেব করতে গিয়ে থেমে গেল। তাড়াতাড়ি একটা কাগজ নিয়ে এসে খস খস করে তাতে হিসেবটা করে ফেলল, তারপর রাঙাদাকে বলল, 'হয়েছে।'

'যা হলো তার সঙ্গে ঐ পৃষ্ঠায় দাগ দেওয়া লাইনের আগে যে-কটা লাইন আছে সেই সংখ্যা যোগ দে।'

'দিয়েছি।'

'যা হলো তাকে দশ দিয়ে গুণ কর।'

'করেছি'।

'এবার ঐ দাগ দেওয়া লাইনের প্রথম দশটা শব্দের মধ্যে যে-কোনো একটা শব্দ বেছে নিয়ে তার নিচে দাগ দে। তারপর ঐ শব্দের আগে যে কটা শব্দ আছে সেই সংখ্যাটা গুণফলের সঙ্গে যোগ দে।'

'দিয়েছি।'

'কতো হলো বল।'

'৩৪৮৮'

রাঙাদা মনে মনে হিসেব করে নিয়ে বলল, 'তাহলে বত্রিশ পৃষ্ঠার চতুর্থ লাইনের পাশে দাগ দিয়েছিস আর ঐ লাইনে নবম শব্দের নিচে দাগ দিয়েছিস।'

গৌতম সঙ্গে সঙ্গে দীপুর হাতে ধরা বইটার ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখল রাঙাদা ঠিক বলল কিনা।

হ্যাঁ তাইতো, রাঙাদা এক্কেবারে ঠিক ঠিক বলে দিয়েছে। কিন্তু কী করে বলল? দীপু আর গৌতম দুজনেরই দারুণ কৌতূহল! কায়দাটা কী জানতেই হয়।

এতক্ষণ রাঙাদা পিছন ফিরে ছিল, এবায় ঘুরে এদিকে তাকাল। রাঙাদা কিছু বলার আগেই দীপু আর গৌতম একসঙ্গে বলে উঠল, 'ঠিক ঠিক মিলে গেছে রাঙাদা। কিন্তু কেমন করে বললে আমাদের শিখিয়ে দাওনা।'

'এরও কায়দা আগের মতো। আমাকে যেই উত্তরটা জানালি ৩৪৮৮ আমি তার থেকে মনে মনে আড়াইশো বিয়োগ করে পেলাম ৩২৩৮, আর তা থেকেই কোন পৃষ্ঠা, কোন লাইন কোন শব্দ বলে দিতে পারলাম।'

দীপু ওরা ব্যাপারটা মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করল। প্রথম দু অংক মিলে বত্রিশ, সেইটাই পৃষ্ঠার নম্বর! তারপর আছে তিন, তিনের পরবর্তী সংখ্যা হয় চার, আর সেইটাই লাইনের নম্বর। মানে চতুর্থ লাইন। একইভাবে সবশেষের অংকটা থেকে কোন শব্দ সেটা পাওয়া গেল। আটের পরবর্তী সংখ্যা হয় নয়, কাজেই নবম শব্দ।

গৌতম বলল, 'ও, এই ব্যাপার, এ-তো সোজা।'

'একবার জেনে গেলে সবকিছুই সোজা লাগে', দীপু গৌতমের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বলল।

[পৃষ্ঠা, লাইন আর শব্দ বলবার আগে রাঙাদা দীপুর বলা উত্তর থেকে ২৫০ বিয়োগ করে নিয়েছে কারণ পৃষ্ঠাসংখ্যার দশগুণের সঙ্গে দীপুকে ২৫ যোগ করতে বলেছিল। যদি ৫০ যোগ করতে বলত তাহলে বিয়োগ করতে হতো ৫০০, যদি যোগ করতে বলত ২০ তাহলে উত্তর থেকে বিয়োগ করতে হতো ২০০, এইরকম।]

স্মরণীয় দিন

'তোর জীবনের একটা স্মরণীয় দিনের কথা মনে ক'র—চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে রাঙাদা বলল।

হঠাৎ রাঙাদার এরকম কথার কোনো মানে বুঝতে পারল না দীপু। রাঙাদা কি আবার রচনা-টচনা লিখতে বলবে নাকি? এইতো সেদিন ক্লাসে বাংলা স্যার রচনা লিখতে দিয়েছিল—তোমার জীবনের সবচাইতে স্মরণীয় দিন। ওদের ক্লাসের ফার্স্ট বয় রতন লিখেছিল একদিন বাসে চাপা পড়া একটা লোককে ওরা লোকজন ডেকে ট্যাক্সিতে তুলে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছিল তার কথা। লোকটা হাসপাতালে ভালো হয়ে উঠেছিল। পরে একদিন নাকি রতনদের বাড়ী এসে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গিয়েছিল।

দীপু অবিশ্যি জানত রতনকে নিয়ে ওরকম ঘটনা আসলে ঘটেইনি। বইতে লেখা আছে, আর রতন বই পড়েই নিজেকে নিয়ে

ওরকম ঘটনার কথা লিখেছে। দীপু সত্যিকারের ঘটনার কথা মনে করেছিল অনেকক্ষণ ধরে, কিন্তু লেখা আর হয়নি তার আগেই ঘণ্টা পড়ে গিয়েছিল।

রাঙাদা অবিশ্যি সবচাইতে স্মরণীয় দিনের কথা বলেনি, যে-কোনো একটা স্মরণীয় দিনের কথা মনে করতে বলেছে। দীপুর চট করে মনে পড়ে গেল পুরী যাওয়ার দিনের কথা। পুরীর সমুদ্রের কথা এর আগে ও শুনেছে কিন্তু দেখেনি কোনোদিন, তাই সেবার গরমের ছুটিতে বাবার সঙ্গে যেদিন ও পুরী গেল সেদিন ওর খুব আনন্দ হয়েছিল। সেদিনটার কথা ওর বেশ মনে আছে। ডাইরিতে লিখেও রেখেছে সেদিনের কথা।

এদিকে গৌতমও মনে মনে একটা দিনের কথা ভেবেছে। যেদিন ও প্রথম চিড়িয়াখানায় গেল সেদিনের কথা।

ওরা রাঙাদাকে বলল, 'তুমি আবার কিছু লিখতে-টিখতে দেবে নাকি রাঙাদা?'

রাঙাদা বলল, 'না রে, না। তোরা যে-যে দিনের কথা ভেবেছিস, মানে তোদের স্মরণীয় দিনের তারিখ মাস বছর আমাকে না বললেও আমি বার করে দিতে পারি।'

ওদের কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে রাঙাদা বলল 'যা চট করে কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে আয়।'

দীপু আর গৌতম খুব খুশি। আজ একটা নতুন কায়দা শেখা যাবে। দীপু এক দৌড়ে কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে এল।

দীপু আর গৌতম কাগজ পেন্সিল নিয়ে রেডি।

রাঙাদা বলল, 'তোদের স্মরণীয় দিন মাসের যে তারিখে পড়েছে সেই তারিখকে কুড়ি দিয়ে গুণ করে গুণফলের সঙ্গে দুশো বাইশ যোগ দে।'

ওরা দুজনেই আলাদাভাবে কাগজের ওপর পেন্সিল নিয়ে খস খস করে হিসেব করতে লেগে গেল।

দীপু বরাবরই যোগ-বিয়োগ গুণ ভাগে চটপটে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই রাঙাদার কথামতো ও গুণ আর যোগ করে ফেলল। গৌতমের তখনো হয়নি। ও সেদিকে তাকিয়ে উসখুশ করতে লাগল। গৌতমেরও অবিশ্যি বেশিক্ষণ লাগল না হিসেব করতে। শেষ হতেই ওরা দুজনে রাঙাদার দিকে তাকাল। মানে, হয়ে গেছে।

'যা হলো তাকে পাঁচ দিয়ে গুণ কর,'—বলে রাঙাদা ওদের দুজনের দিকে তাকাল।

'হয়ে গেছে।'

'এবার ওর সঙ্গে মাসের সংখ্যা যোগ দে। মাসটা যদি জানুয়ারি হয় তাহলে যোগ দিবি ১, ফেব্রুয়ারি হলে ২, মার্চ হবে ৩— এইরকম আর কী।'

'দিয়েছি।'

'যা হলো তাকে একশো দিয়ে গুণ কর।'

'করেছি।'

এবার ওর সঙ্গে তোদের স্মরণীয় দিন যে বছরে পড়ছে সেই সালটা যোগ দে। সালটা ১৯৭৫ হলে যোগ দিবি শুধু ৭৫ ; ১৯৭৬ সাল হলে যোগ দিবি শুধু ৭৬—এই রকম আর কী।'

'দিয়েছি।'

'এর সঙ্গে আরো ১৮১ যোগ দে।'

'দিয়েছি।'

'কতো হলো আমাকে এক এক করে বল। প্রথমে দীপু বল।'

দীপু ওর হাতে ধরা কাগজটার দিকে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ওর উত্তরটা জানাল—২৩১৭৮৫।

ততোক্ষণে রাঙাদার চা খাওয়া হয়ে গেছে। চায়ের কাপটা নিচে রেখে হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে কলম আর এক টুকরো কাগজ নিয়ে সংখ্যাটা লিখল। তারপর কয়েক সেকেণ্ড ভেবে নিয়ে বলল, 'দীপু যে দিনের কথা ভেবেছে সেটা হলো ১২ই জুন, ১৯৭৪।'

—বলেই রাঙাদা গৌতমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোর কতো হয়েছে ?' গৌতম বলল '৩৯২৩৮৭।'

আগের মতোই কাগজের ওপর সংখ্যাটা লিখে রাঙাদা একটু ভেবে বলল, 'তোর স্মরণীয় দিন হলো ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৭৬।' তারপরই একটু মুচকি হেসে বলল, 'অবাক লাগছে, তাই না ? ভাবছিস কেমন করে বললাম, এইতো ?'

ঠিক এই কথাই ভাবছে দীপু আর গৌতম। ওরা বুঝল, রাঙাদা এবার কায়দাটা বুঝিয়ে দেবে। তাই কিছু না বলে ওরা রাঙাদার দিকে তাকিয়ে রইল। রাঙাদা কী বলে তা শোনার জন্য অপেক্ষা করে রইল।

রাঙাদা বলল, ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, তোরা যে-যে সংখ্যা বললি আমি সেটা কাগজে লিখে মনে মনে তা থেকে ১১১১১১ (ছ'টা ১) বিয়োগ করে তোদের যার যার স্মরণীয় দিনের সাল তারিখ পেয়ে গেলাম।'

রাঙাদা কাগজে বিয়োগ করে দেখাল,

দীপু	গৌতম
২৩১৭৮৫	৩৯২৩৮৭
১১১১১১	১১১১১১
১২০৬৭৪	২৮১২৭৬

'দীপুর বেলায় যে বিয়োগফল হলো তাকে ডান দিক থেকে জোড় বাঁধলে দাঁড়ায় ১২-০৬-৭৪ ; একেবারে ডানদিকের জোড় থেকে সাল, মাঝের জোড় থেকে মাস আর একেবারে বাঁ দিকে যা রইল সেটাই হল তারিখ। গৌতমের বেলায় সাল তারিখও এইভাবেই পাওয়া গেল। ধর, যদি বিয়োগফল হয় ৫০৪৭৩ তাহলে দিনটা হবে ৫ই এপ্রিল, ১৯৭৩।'

'আচ্ছা, ১৯৭৩ না হয়ে ১৮৭৩ ও তো হতে পারে ?'—গৌতম হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসে।

রাঙাদা একটু অবাক হয়, 'তোর বুদ্ধিটা তো খুলছে দেখছি। হ্যাঁ, তা হতে পারে বটে। ১৭৭৩ ও হতে পারে। তবে কোনটা হওয়া সম্ভব সেটা নিজেকে বুঝে নিতে হবে। যেমন, তোর স্মরণীয় দিন ১৭৭৬ কি ১৮৭৬ সালে হতেই পারে না, কারণ ঐ সময়ে তোর জন্মই হয়নি।

আর একটা কথা। ঠিক এই নিয়মে কারো জন্মতারিখও বলে দেওয়া যায়। বন্ধুদের দেখাতে পারিস খেলাটা।'

ক্যালেণ্ডারের মজা

সন তারিখ নিয়ে ধাঁধা যখন চলছিল, গৌতমের তখন তপুর কথা মনে পড়ছিল। তপু সেদিন এসেছিল গৌতমকে জন্মদিনের নেমন্তন্ন করতে। সেই চার বছর আগের নেমন্তন্নের পর আবার এবারের নেমন্তন্ন। চার বছর বাদে নেমন্তন্ন করতে পেরে তপু খুব খুশি হয়েছিল। গেল তিন বছর ও ওর বন্ধুদের জন্মদিনে নেমন্তন্ন খেয়েছে, কিন্তু ও কাউকে নেমন্তন্ন করতে পারেনি সেজন্যে ওর মনে ভারী দুঃখ। জন্মদিনই আসেনি তো নেমন্তন্ন করবে কী। চারবছর বাদে আবার জন্মদিন এলো।

রাঙাদা বলল, কেন এরকম হয় তা-তো জানিসই। ২৯শে ফেব্রুয়ারি জন্ম হলেই এরকম হবে। ২৯শে ফেব্রুয়ারি এমন একটা দিন যেটা সব বছর ক্যালেণ্ডারের পাতায় থাকে না, চারবছর পরপর লিপইয়ারে এই দিনটাকে ক্যালেণ্ডারের পাতায় দেখতে পাওয়া যায়। যেমন আবার দেখতে পাওয়া যাবে ১৯৮৮ সালে।

দীপু বলল, তার মানে আবার ওলিম্পিক যে বছর হবে সেই বছরে।

ঠিক তাই, রাঙাদা বলল, তোর মন থেকে এখনো ওলিম্পিকের রেশ কাটেনি দেখছি।

তা যাক গে যাক, ক্যালেণ্ডারের কথাই যখন উঠল তখন দেখা

যাক ক্যালেণ্ডারের মধ্যে মজার কিছু খুঁজে পাওয়া যায় কিনা,—রাঙাদা নিজেই প্রস্তাবটা করল।

দীপু আর গৌতম বুঝল রাঙাদা নিশ্চয়ই ক্যালেণ্ডার নিয়ে মজার কিছু ভেবেছে। ওরা তাই সামনের দেয়ালে টাঙানো লম্বা ক্যালেণ্ডারটার দিকে তাকাল।

রাঙাদা বলল, কিরে কিছু বুঝছিস ?

ক্যালেণ্ডারের দিকে চোখ রেখেই ওরা ঘাড় নাড়ল। নাঃ, তেমন কিছু চোখে পড়ছে না।

রাঙাদা ইশারা করতেই দীপু দেয়াল থেকে ক্যালেণ্ডারটা খুলে নিয়ে এল।

রাঙাদা বলল, যে কোনো মাসের পরপর তিনটে সপ্তাহ নিয়ে দেখবি মধ্যিখানের তারিখের ওপরে-নিচে সংখ্যা দুটোর যা যোগফল ডাইনে-বাঁয়ে সংখ্যা দুটোর কি কোণাকুণি সংখ্যা দুটোর যোগফলও তাই। যেমন ধর ডিসেম্বর মাস। পরপর যে কোনো তিনটে সপ্তাহ ছাখ। প্রথম তিনটে সপ্তাহই ধর। তারিখগুলো কী আছে ছাখ। রবি থেকে শনিবার তারিখগুলো—

রবি	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২

ঠিক মধ্যিখানে রয়েছে ১২, এর ওপরে নিচে আছে ৫ আর ১৯, এই দুটো সংখ্যার যোগফল ২৪, ডাইনে বাঁয়ে রয়েছে ১৩ আর ১১, এদের যোগফলও তাই, মানে ২৪। আবার কোণাকুণি ৬ আর ১৮ কিংবা ৪ আর ২০-এর যোগফলও সেই ২৪।

আবার ১২-র ডাইনে-বাঁয়ে সমান দূরত্বে যে-কোনো দুটো সংখ্যা যেমন ১৪ আর ১০ কিংবা ১৫ আর ৯, এদের যোগফলও সেই একই।

দীপু লক্ষ্য করল কোণাকুণিভাবে ধরলেও এটা হবে। ৭, ১৭ কিংবা ৩, ২১ আবার ৮, ১৬ কিংবা ২, ২২ এর যোগফলও সেই ২৪।

রাঙাদা বলল আসলে যে কোনো মাসেরই যে কোনো একটা তারিখ ধরে ডাইনে বাঁয়ে এবং ওপরে নিচে এভাবে যোগ করলে যোগফল একই হবে। ঐ ডিসেম্বর মাসেরই ১৪ তারিখটা ধরা যাক। ১৪-র ডাইনে বাঁয়ে রয়েছে ১৫ আর ১৩, যোগফল ২৮। ওপরে নিচে ৭, ২২-এর যোগফল কিংবা কোণাকুণি ৮, ২০ কি ৬, ২২-এর যোগফলও ২৮।

ঠিক ঐভাবে ১১ তারিখটার ডাইনে বাঁয়ে, ওপরে নিচে কি কোণা কুণি দুটো করে সংখ্যা নিয়ে ওরকম যোগ করলে যোগফল হবে ২২।

দীপু আর গৌতম রাঙাদার কথামতো মিলিয়ে দেখছিল। এবার ওরা সত্যিই অবাক হলো। ক্যালেণ্ডার এতোদিন শুধু দেখেই এসেছে, শুধুই বার তারিখ মিলিয়েছে, কিন্তু এই ব্যাপারটা তো কেনোদিন লক্ষ্য করেনি।

ওদের হাঁ করা অবাক মুখের দিকে তাকিয়ে রাঙাদা আবার বল , আর একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখবি। লিপইয়ার না হলে (যেমন ১৯৮৫ সাল) জানুয়ারি আর অক্টোবর মাসের তারিখগুলো একই বারে পড়ে। মানে, জানুয়ারি মাসের যে তারিখ যে বারে পড়বে, অক্টোবর মাসের সেই তারিখ সেই বারেই পড়বে। ঠিক এইরকম ব্যাপার ঘটে ফেব্রুয়ারি মার্চ নভেম্বরের বেলায়, আর ঘটে এপ্রিল জুলাই আর সেপ্টেম্বর ডিসেম্বরের বেলায়।

'যদি বছরটা লিপইয়ার হয়?' গৌতম আর কৌতূহল চাপতে পারল না।

বলছি, বলছি। রাঙাদা মুচকি হেসে মাথা ঝাঁকাল একটু।

বছরটা লিপইয়ার হলে (যেমন ১৯৮৪ সাল) এই রকম মিল খাওয়া মাসগুলো হবে জানুয়ারি—এপ্রিল—জুলাই, ফেব্রুয়ারি—আগষ্ট, মার্চ-নভেম্বর আর সেপ্টেম্বর—ডিসেম্বর।

দীপু আর গৌতম অবাক হলো, তাইতো, এ ব্যাপারটাও তো কোনোদিন লক্ষ্য করেনি।

পাছে ভুলে যায় সেজন্য ওরা রাঙাদাকে ফের বলতে বলল। রাঙাদা ফের বলল, ওরা দুজনে কাগজে লিখে নিল। তারপর ওরা সামনে রাখা ক্যালেণ্ডার দেখে মিলিয়ে নিল।

ওরা দুজনে ঠিক করল কাল বন্ধুদের এটা দেখিয়ে অবাক করে দেবে।

ম্যাজিক কার্ড

স্কুল ছুটির পর দীপু দেখল অমিত একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে। তাড়াতাড়ি ওর কাছে গিয়ে বলল, 'কি রে, তখন অতো ডাকলাম শুনতে পাসনি ? তা অংকে কতো পেলি ?'

অমিতের সঙ্গে দীপুর খুব বন্ধুত্ব। অমিত বরাবরই অংকে খুব ভালো। দীপু মাঝে মাঝে ওর কাছ থেকে অংক বুঝেও নেয়। আজ ওদের ক্লাসে অংক পরীক্ষার খাতা দিয়েছে।

অমিত বলল, 'বলতে লজ্জা করছে ভাই, অংকে এত খারাপ নম্বর পাবো ভাবতেই পারিনি।

'তবু বল না।'

অমিত পকেট থেকে ছটা কার্ড বার করে দীপুর হাতে দিয়ে বলল, 'এই নে, এই ছটা কার্ডের দ্বিতীয়, তৃতীয় আর পঞ্চমটাতে আমার নম্বরটা রয়েছে। চেষ্টা করে বার করে নে, আমাকে আর জিজ্ঞেস করিস না, আমার বলতে লজ্জা করছে।'

অমিতের হাবভাব দেখে দীপু একটু অবাক হলো।

দীপু দেখল, প্রত্যেকটা কার্ডে কতকগুলো করে সংখ্যা লেখা

রয়েছে। সংখ্যাগুলো অবিশ্যি যেমন তেমন ভাবে নয়, ছোটো থেকে বড়ো—এইভাবেই সাজানো আছে।

প্রথম কার্ড			দ্বিতীয় কার্ড			তৃতীয় কার্ড		
৮	২৭	৪৬	২	২৩	৪৬	৩২	৪৩	৫৪
৯	২৮	৪৭	৩	২৬	৪৭	৩৩	৪৪	৫৫
১০	২৯	৫৬	৬	২৭	৫০	৩৪	৪৫	৫৬
১১	৩০	৫৭	৭	৩০	৫১	৩৫	৪৬	৫৭
১২	৩১	৫৮	১০	৩১	৫৪	৩৬	৪৭	৫৮
১৩	৪০	৫৯	১১	৩৪	৫৫	৩৭	৪৮	৫৯
১৪	৪১	৬০	১৪	৩৫	৫৮	৩৮	৪৯	৬০
১৫	৪২	৬১	১৫	৩৮	৫৯	৩৯	৫০	৬১
২৪	৪৩	৬২	১৮	৩৯	৬২	৪০	৫১	৬২
২৫	৪৪	৬৩	১৯	৪২	৬৩	৪১	৫২	৬৩
২৬	৪৫		২২	৪৩		৪২	৫৩	

চতুর্থ কার্ড			পঞ্চম কার্ড			ষষ্ঠ কার্ড		
১	২৩	৪৫	১৬	২৭	৫৪	৪	২৩	৪৬
৩	২৫	৪৭	১৭	২৮	৫৫	৫	২৮	৪৭
৫	২৭	৪৯	১৮	২৯	৫৬	৬	২৯	৫২
৭	২৯	৫১	১৯	৩০	৫৭	৭	৩০	৫৩
৯	৩১	৫৩	২০	৩১	৫৮	১২	৩১	৫৪
১১	৩৩	৫৫	২১	৪৮	৫৯	১৩	৩৬	৫৫
১৩	৩৫	৫৭	২২	৪৯	৬০	১৪	৩৭	৬০
১৫	৩৭	৫৯	২৩	৫০	৬১	১৫	৩৮	৬১
১৭	৩৯	৬১	২৪	৫১	৬২	২০	৩৯	৬২
১৯	৪১	৬৩	২৫	৫২	৬৩	২১	৪৪	৬৩
২১	৪৩		২৬	৫৩		২২	৪৫	

দীপু কার্ডগুলো হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখল। এমন সংখ্যা খুঁজে বার করতে হবে যা দ্বিতীয়, তৃতীয় আর পঞ্চম কার্ডে রয়েছে, অথচ বাকি কার্ডগুলোতে নেই। সেই সংখ্যাটাই হবে অমিতের অংকে পাওয়া নম্বর।

একটা একটা করে সংখ্যা নিয়ে দীপু পরখ করে দেখতে লাগল। কিন্তু খানিক বাদেই বুঝল এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করার

কোনো মানে হয়না, তার চেয়ে কার্ডগুলো বাড়ি নিয়ে যাওয়া ভালো।
রাঙাদাকে দেখানো যাবে।

অমিতকে বলে ও কার্ডগুলো বাড়ি নিয়ে এল।

রাত্তিরে রাঙাদাকে কার্ডগুলো দেখাল, অমিতের ব্যাপারটাও বলল। অমিতের নম্বরের ব্যাপারটা শুনেই রাঙাদা কার্ডগুলার ওপর এক পলক চোখ বুলিয়ে বলে দিল—অমিত অংকে পঞ্চাশ পেয়েছে।

সে-কি! মাত্র পঞ্চাশ! অমিত ক্লাশের মধ্যে অংকে সেরা। নব্বুই পাঁচানব্বুই ও হেসে খেলেই পায় প্রত্যেকবার। এবার কি না মাত্র পঞ্চাশ। বন্ধুর জন্য ওর মনটা একটু খারাপ হলো।

দীপু বললো, 'আচ্ছা রাঙাদা বলতো আমি কতো পেয়েছি?'

'তোর নম্বর কোন কোন কার্ডে আছে?'

'তৃতীয়, পঞ্চম আর ষষ্ঠ কার্ডে। কার্ডগুলোর ওপর চোখ রেখে দীপু বলল।

'তাহলে—তুই পেয়েছিস—হ্যাঁ, বাহান্ন।

দীপু অবাক হলো। রাঙাদা এমন চটপট কী করে বলে দিচ্ছে। কোনো ম্যাজিক আছে নাকি?

দীপুকে অবাক হতে দেখে রাঙাদা বলল, 'অবাক হবার তেমন কিছু নেই। ভাবছিস, কী করে চটপট বলে দিলাম, এইতো! অমিত বলেছে ওর নম্বর দ্বিতীয়, তৃতীয় আর পঞ্চম কার্ডে আছে। ঐ তিনটে কার্ডের প্রত্যেকটার শুরুতে যে সংখ্যাগুলো আছে, মানে ২, ৩২ আর ১৬—এই তিনটে সংখ্যা মনে মনে যোগ করেই অমিতের নম্বর জেনে গেলাম। তোর নম্বরের বেলায়ও ঐ একই নিয়ম। মিলিয়ে দ্যাখ—

দীপু তৃতীয়, পঞ্চম আর ষষ্ঠ কার্ডের প্রথম সংখ্যাগুলো যোগ করে দেখল ওর নম্বরের সঙ্গে মিলে গেছে। —৩২+১৬+৪=৫২

'কিন্তু,' দীপু বলল, 'তৃতীয়' পঞ্চম, আর ষষ্ঠ কার্ডে ৫২ ছাড়া আরো সংখ্যা, যেমন ধরো ৫৩, ৫৪, ও ৫৫, ও আছে।'

'তা আছে। কিন্তু ৫৩, ৫৪, আর ৫৫—এদের প্রত্যেকে তৃতীয়,

পঞ্চম এবং ষষ্ঠ ছাড়াও অন্য কোনো না কোনো কার্ডে আছে। ভলো করে ছাখ।'

তা ঠিক। দীপু দেখল ৫৩ সংখ্যাটা চতুর্থ কার্ডেও আছে।

'৫২-ই হচ্ছে একমাত্র সংখ্যা যা তৃতীয়, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ কার্ডে আছে কিন্তু অন্য কোনো কার্ডে নেই। মোট কথা, কোনো সংখ্যা এই ছটা কার্ডের ঠিক কোন কোন কার্ডে আছে জানলে সংখ্যাটা কী তা বলে দেওয়া যায় চটপট।'

দীপু আর একটা সংখ্যা ধরে ব্যাপারটা আরেকবার মিলিয়ে দেখল। ও দেখল ৬২ শুধু চতুর্থ কার্ড ছাড়া বাকি পাঁচটা কার্ডেই আছে। ঐ কার্ড পাঁচটার সংখ্যাগুলো, মানে, ৮, ২, ৩২. ১৬ আর ৪ যোগ করলে ঠিক ৬২ হচ্ছে।

দীপু হঠাৎ লক্ষ্য করল, সবকটা কার্ডের শেষ সংখ্যা ৬৩, মানে ৬৩-র ওপর কোনো সংখ্যা নেই। তাহলে ৬৩-র চাইতে বড়ো কোনো সংখ্যার বেলায় তো এই ম্যাজিক খাটবেনা।

রাঙাদা বলল, 'খাটবে বৈকি! তবে হ্যাঁ, তখন এই রকম আরো কার্ড লাগবে। মাত্র ছটা কার্ডে চলবেনা। একটা জিনিস লক্ষ্য করে ছাখ, এই ছটা কর্ডের সর্ব প্রথম সংখ্যাগুলো হলো ১, ২, ৪, ৮, ১৬ আর ৩২। কাজেই—'

'বুঝেছি বুঝেছি। আর একটা কার্ড নিলে সেটা শুরু হবে ৬৪ দিয়ে, তার পরের কার্ডটা শুরু হবে ১২৮ দিয়ে—এই তো?

'ঠিক বলেছিস। আর একটা জিনিস ছাখ, যে-কার্ডটা ১ দিয়ে শুরু হয়েছে (চতুর্থ কার্ড) সেটাতে তার পরের একটা সংখ্যা মানে, ২ বাদ। আবার ৩ আছে, ৪ বাদ--এইভাবে চলেছে। যে কার্ডটা ২ দিয়ে শুরু (দ্বিতীয় কার্ড) সেটাতে পর পর দুটো সংখ্যা আছে, তারপর পর পর দুটো সংখ্যা বাদ। যেমন ২, ৩ আছে তারপর ৪, ৫ বাদ ; ৬, ৭ আছে, ৯, ১০ বাদ—এইভাবে।'

দীপু দেখল ষষ্ঠ কার্ডটা ৪ দিয়ে শুরু হয়ে পরপর চারটে সংখ্যা

আছে, তারপর ৮ থেকে ১১ পরপর এই চারটে সংখ্যা নেই, আবার তার পরের চারটে সংখ্যা ১২ থেকে ১৫ আছে, ঠিক তারপর ১৬ থেকে ১৯ পরপর এই চারটে সংখ্যা নেই—এইভাবে চলেছে। সবগুলো কার্ড এই নিয়মে তৈরী হয়েছে।

দীপু বলল, 'তাহলে সাতটা কার্ড যদি থাকে তো সপ্তম কার্ডটা ৬৪ দিয়ে শুরু হয়ে ১২৭-এ শেষ হবে (পরপর ৬৪ টা সংখ্যা)।

ঠিক তাই, আর তখন সবগুলো কার্ডের শেষ সংখ্যা হবে ঐ ১২৭, 'আর আটটা কার্ড হলে অষ্টম কার্ডটা শুরু হবে ১২৮ দিয়ে আর শেষ হবে ২৫৫ দিয়ে (পরপর ১২৮ টা সংখ্যা) আর তখন সবগুলো কার্ডেরই শেষ সংখ্যা ২৫৫ হবে।'

'এই তো, ঠিক বুঝেছিস দেখছি। তাহলে দেখতে পাচ্ছিস, এই রকম সংখ্যাওয়ালা বেশ কয়েকটা কার্ড থাকলে অনেক বড়ো সংখ্যাও না দেখে বলে দেওয়া যায়, যদি জানা যায় সংখ্যাটা কোন কোন কার্ডে আছে। সংখ্যাটা যে যে কার্ডে আছে সেই সেই কার্ডের সর্বপ্রথম সংখ্যাগুলো যোগ করলেই হলো!'

পরদিন দীপু কার্ডগুলো অমিতকে দিয়ে বলল, 'তোর অংকের নম্বর আমি জানি।'

অমিত বলল, 'খুঁজে বার করেছিস তাহলে।'

'বারে, খুঁজে খুঁজে বার করব কেন, সোজা নিয়ম তো আমি জেনে গেছি। কিন্তু কার্ডগুলো তুই পেলি কোথায় বলতো?'

'আমিই বানিয়েছি। একটা বই পড়ে শিখেছি। দুদিন আগে বানিয়েছি, সঙ্গেই রয়ে গেছে! কাল তুই নম্বর জিজ্ঞেস করাতে ওটা কাজে লাগিয়ে দিলাম।'

দীপু ঠিক করল ও নিজেও ঐ রকম কার্ড বানাবে।

যোগের ম্যাজিক

সেদিন রাঙাদা বাড়ি ফিরতেই ওরা রাঙাদাকে ছেঁকে ধরল। ওরা মানে দীপু আর গৌতম। আগে ওদের অংকের ম্যাজিক দেখাতে হবে তারপর অন্য কিছু। অংক নিয়ে যে আগে মজার মজার খেলা হয় তা আগে কে জানত!

রাঙাদাও যেন তৈরীই ছিল, বলল,—'কাগজ পেন্সিল নিয়ে রেডি হয়ে বোস, আমি ততক্ষণে একটু ভেবে নিই।'

দীপুর ইশারায় গৌতম টেবিল থেকে একটা সাদা কাগজ আর কলম নিয়ে এল।

একটু পরে রাঙাদা কাগজ কলম নিজের হাতে নিয়ে চার অংকের একটা সংখ্যা লিখল—৯১২৩।

কাগজটা ফের ওদের দিকে এগিয়ে দিয়ে রাঙাদা বলল, এই সংখ্যাটার নিচে তোরা দুজনে দুটো চার অংকেরই সংখ্যা লিখবি, তার নিচে আমি আবার দুটো সংখ্যা লিখব। মোট এই পাঁচটা সংখ্যা যোগ করলে—যোগফল কতো হবে আমি বলে দিতে পারি।'

'কিন্তু আমাদের সংখ্যা তো আমরা লিখলামই না এখনো! আমরা কী লিখব সেটা না জেনে কী করে আগে থেকে যোগফল বলবে?

'তোরা যে-সংখ্যাই লিখিস না কেন, যোগফল আমি জেনে গেছি।'

'বেশ, বলতো?'

'যোগফল হবে ৩১৩৪৩; এবার তোদের সংখ্যা লেখ।'

রাঙাদার লেখা সংখ্যার নিচে দীপু লিখল—৬৩৭১।

গৌতম তার নিচে লিখল—৪৬৫৮।

তারপর কাগজটা হাতে নিয়ে রাঙাদা আরো দুটো সংখ্যা লিখল —৪৭৩৯, ৬৪৫২।

রাঙাদা :	৯১২৩
দীপু :	৬৩৭১
গৌতম :	৪৬৫৮
আবার :	৪৭৩৯
রাঙাদা :	৬৪৫২
যোগফল	৩১৩৪৩

দীপু আর গৌতম অবাক হয়ে দেখল যোগফল রাঙাদা যা বলেছিল তাই হলো।

কিন্তু ওরা কোন্ সংখ্যা লিখবে না জেনেও রাঙাদা কেমন করে যোগফল আগে থেকেই বলে দিল? ওরা যদি অন্য সংখ্যা লিখত, তাহলে?

রাঙাদা বলল—'কায়দাটা এমন কিছু শক্ত নয়। তোরা যে-দুটো সংখ্যা লিখলি আমি তার সঙ্গে মিলিয়ে শেষের সংখ্যা দুটো লিখলাম। তার মানে শেষের সংখ্যা দুটো আমার ইচ্ছেমতো হলো না।'

'একটু বুঝিয়ে বলো।' দীপু বলল।

'চতুর্থ সংখ্যাটা এমন ভাবে লিখিলাম যাতে এর প্রত্যেকটা অংক ওপরকার তোর লেখা অংকের সঙ্গে যোগ করলে দশ হয়। যেমন, তোর সংখ্যার একেবারে ডানদিকে আছে ১, কাজেই চতুর্থ সংখ্যায় আমি ডানদিকে নিলাম ৯, তারপরের অংকটা লিখেছিস ৭, কাজেই আমি নিলাম ৩; বাকি অংক দুটোর বেলায়ও এই নিয়ম। আবার গৌতম একেবারে ডানদিকে লিখেছে ৮, তাই সবশেষের সংখ্যার একেবারে ডানদিকে আমি নিয়েছি ২, কেননা ৮-এর সঙ্গে ২ যোগ করলে তবেই দশ হয়।'

দীপুর সংখ্যা : ৬ | ৩ | ৭ | ১ গৌতমের সংখ্যা : ৪ | ৬ | ৫ | ৮
চতুর্থ সংখ্যা : ৪ | ৭ | ৩ | ৯ শেষের সংখ্যা : ৬ | ৪ | ৫ | ২

১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০

'তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু উত্তরটা যে ৩১৩৪৩ হবে আগেই তা কেমন করে বললে ?

'গোড়ায় যে সংখ্যাটা লিখেছি, মানে, ৯১২৩, এর সঙ্গে স্রেফ ২২২২০। (চারটে পরপর দুই-এর পিঠে শূন্য) যোগ করে—'

২২২২০
৯১২৩

৩১৩৪৩—সংখ্যা পাঁচটার যোগফল

একটু থেমে রাঙাদা আবার বলল—'এখানে সবকটা সংখ্যা চার অংকের বলে আগে থেকে উত্তর জানবার জন্যে প্রথম সংখ্যাটার সঙ্গে চারটে ২-এর পিঠে শূন্য বসিয়ে যোগ করলাম. পাঁচ অংকের হলে পাঁচটা ২-র পিঠে শূন্য বসিয়ে যোগ করতাম। আর এই যোগ তো মুখে মুখেই করা যায়, কী বলিস ?' রাঙাদা গৌতমের দিকে তাকাল।

'তা যায়। আচ্ছা, এবার আমি একটা পাঁচ অংকের সংখ্যা নিয়ে শুরু করছি। তুমি আর গৌতম তার পরের দুটো সংখ্যা লিখবে আবার শেষের দুটো সংখ্যা আমি লিখব। যোগফলটা আমি আগেই বলে দিচ্ছি।'

গৌতম সংখ্যাটা লিখল—১৮৯২৩, তারপরই উত্তরটা লিখে দিল —২৪১১৪৩ ; পরপর সংখ্যাগুলো এই-রকম লেখা হলো :

গৌতম : ১৮৯২৩
দীপু : ৩৫৬৩১
রাঙাদা : ৭২০১২
আবার : ৭৫৪৭৯
গৌতম : ৩৯০৯৮

যোগফল : ২৪১১৪৩

২২২২২০
১৮৯২৩

২৪১১৪৩ যোগফল

(এখানে রাঙাদার সংখ্যার মধ্যিখানের অংকটা ০, কাজেই শেষ সংখ্যার মধ্যিখানের অংকটা ০ নিয়ে তার বাঁ দিকের অংকটা ৮ না লিখে ১ বাড়িয়ে ৯ লেখা হলো। শূন্যের বেলায় এই নিয়ম মানতে হবে। শেষ সংখ্যাটা অবিশ্যি গৌতম রাঙাদার হেল্প নিয়েই লিখেছে।)

এর মধ্যে কখন রিনকি এসে দাঁড়িয়েছে ওরা খেয়াল করেনি। রিনকি বুঝল রাঙাদা নিশ্চয়ই মজার কিছু শেখাচ্ছে। ও বায়না ধরল ওকেও শেখাতে হবে।

'তোর ঐটুকু মাথায় অতো সব ঢুকবেনা, বুঝলি?' গৌতম ওকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল।

দীপু হঠাৎ রাঙাদাকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, যদি আরো বেশি সংখ্যা হয় তাহলেই কি এই একই নিয়ম খাটবে?'

'মোটামুটি একই নিয়ম। ধর, প্রথম সংখ্যাটার পর তিনটে যে কোনো সংখ্যা লেখা হলো আর তার সঙ্গে আগের মতোই মিলিয়ে আরো তিনটে সংখ্যা লেখা হলো। তাহলে প্রথম সংখ্যাটা বাদে আরো ছটা মানে তিন জোড়া সংখ্যা হলো। যদি ঐ সংখ্যাগুলো প্রত্যেকটা চার অংকের হয় তাহলে ঐ তিন জোড়া মানে ছটা সংখ্যার যোগফল হবে ৩৩৩৩০; আর চার জোড়া, মানে আটটা সংখ্যা যদি হয় তো যোগফল হবে ৪৪৪৪০।

'তাহলে এর সঙ্গে প্রথম সংখ্যা যোগ করেই সবগুলো সংখ্যার যোগফল বলে দেওয়া যায়—বাকি সংখ্যাগুলো লিখবার আগেই, তাই না?'

'ঠিক বলেছিস, তাহলে এবারেরটা তুই কর। তুই প্রথম সংখ্যাটা লেখ, তারপর আমরা তিনজন তিনটে সংখ্যা লিখি —।'

দীপু চার অংকের একটা সংখ্যা লিখল—৩৪০৭, তারপর মনে মনে হিসেব করে উত্তরটা বলে দিল—৩৬৭৩৭

পর পর সংখ্যাগুলো এইভাবে লেখা হলো—

দীপু—	৩৪০৭
রাঙাদা—	১৫৬২
গৌতম—	৫৮৪৩
রিনকি—	২৮৯০
আবার—	৯৫৪৮
দীপু—	৫২৬৭
	৮২২০
যোগফল —	৩৬৭৩৭

	৩৩৩৩০
	৩৪০৭
যোগফল :	৩৬৭৩৭

'মিলে গেছে !' দীপু হাততালি দিয়ে উঠল।

দীপু আর গৌতম দুজনেই ঠিক করল বন্ধুদের এই সুন্দর ম্যাজিকটা দেখিয়ে অবাক করে দেবে।

সংখ্যার ম্যাজিক

রাঙাদা বাড়ি ফিরতেই দীপু আর গৌতম ধরল, ওদের নতুন নতুন খেলা শেখাতে হবে। অংকের খেলা। মানে ম্যাজিক। বন্ধু বান্ধবদের দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে হবে।

কী খেলা শেখানো যায়, রাঙাদা ভাবতে লাগল। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে তারপর রাঙাদা ওদের কাগজ পেন্সিল নিয়ে রেডি হতে বলল।

কাগজ পেন্সিল হাতের কাছেই ছিল কাজেই রেডি হতে ওদের মোটেই সময় লাগল না।

রাঙাদা ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি তোদের দিকে পিছন ফিরে বসছি, তোরা দুজনে আলাদাভাবে পাঁচ কিংবা তার বেশি অংকের যে-কোনো সংখ্যা ধর।'

রাঙাদা ওদের দিকে পিছন ফিরে বসল।

দীপু আর গৌতম দুজনে যার যার পছন্দ মতো সংখ্যা কাগজে লিখল।

রাঙাদা বলল, 'যে সংখ্যা ধরেছিস তা থেকে সংখ্যার অংকগুলোর যোগফল বিয়োগ কর।'

'করেছি।'

'বিয়োগফলের যে-কোনো একটা অংক কেটে দে।'

'দিয়েছি।'

'বাকি অংকগুলো আমাকে বল। প্রথমে গৌতম বল।'

গৌতম বাকি অংকগুলো জানাল—৩, ২, ১, ৩

রাঙাদা বলল, 'তাহলে গৌতম শূন্যটাকে কেটেছে।'

এবার দীপুর পালা। দীপুর বেলায় কেটে দেওয়া অংকটা বাদে বাকি অংকগুলো হলো ৫, ১, ৩, ২, ১।

রাঙাদাকে জানাতেই রাঙাদা মনে মনে হিসাব করে বলে দিল— দীপু ৬-টাকে কেটে বাদ দিয়েছে।

দীপু আর গৌতম ছজনেই ভাবতে লাগল বাকি অংকগুলো শুনে রাঙাদা কী করে কাটা অংক বলে দিচ্ছে।

রাঙাদা বলল, 'খুব সোজা। কাটা অংকটা জানা যায় ৯ থেকে বাকি অংকগুলোর যোগফল বিয়োগ করলে। গৌতম বাকি অংক-গুলো যা বলেছে সেগুলোর যোগফল ৯; ৯ থেকে ৯ বিয়োগ করলে শূন্য। কাজেই গৌতম শূন্য কেটে বাদ দিয়েছে।

আবার দীপু বাকি অংকগুলো যা বলেছে সেগুলোর যোগফল ১২; যোগফলটা এক অংকের বেশি বলে এর অংকগুলোকে আবার যোগ করলাম। ১ আর ২-য়ে যোগ করলে ৩; ৯ থেকে এই তিন বিয়োগ করলে হয় ৬, কাজেই বোঝা গেল দীপু ৬-টাকে কেটে বাদ দিয়েছে।'

[গৌতম প্রথমে ধরেছিল ৩২১১৭, এর অংকগুলোর যোগফল ৩+২+১+১+৭=১৪; ৩২১১৭—১৪=৩২১০৩, শূন্যটা কেটে বাকি অংকগুলো ৩,২,১,৩ রাঙাদাকে জানিয়েছিল।

দীপু ধরেছিল ৫৬১৩৪৭, এর অংকগুলোর যোগফল ৫+৬+১+৩

+৪+৭=৫৬১৩৪৭,—২৬=৫৬১৩২১, এ থেকে ৬-টা কেটে বাদ দিয়ে বাকি অংকগুলো ৫, ১, ৩, ২ রাঙাদাকে জানিয়েছিল।]

(২) রাঙাদা পিছন ফিরে থাকা অবস্থাতেই পকেট থেকে একটা আধুলি আর একটা সিকি ওদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'এই দুটো তোদের দুজনের কাছে রাখ। কে কোনটা রাখলি আমি না দেখেই বলে দেবো।'

দীপু আর গৌতম নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে একজন আধুলি আর একজন সিকি রাখল। পরামর্শটা এমনভাবে করল যাতে রাঙাদা কিছু শুনতে বা বুঝতে না পারে।

রাঙাদা বলল, 'যে আধুলি নিয়েছিস সে যে কোন একটা জোড় সংখ্যা আর যে সিকি নিয়েছিস সে যে-কোনো একটা বিজোড় সংখ্যা মনে মনে ধর।'

'ধরেছি।'

'এবার দীপু যে-সংখ্যা ধরেছিস তাকে যে-কোনো একটা জোড় সংখ্যা দিয়ে গুণ কর।'

'করেছি।'

'গৌতম যে-সংখ্যা ধরেছিস তাকে যে কোনো বিজোড় সংখ্যা দিয়ে গুণ কর।'

'করেছি।'

'দুজনের গুণফল যা হলো সে-দুটো যোগ কর।'

দীপু গৌতমের গুণফলটা জেনে নিয়ে নিজের গুণফলের সঙ্গে যোগ করল। তারপর রাঙাদাকে জানাল, 'করেছি।'

'যোগ করে যা হলো তাকে দুই দিয়ে ভাগ কর।'

'করেছি।'

'কোনো ভাগশেষ আছে?'

'না।'

'তাহলে গৌতমের কাছে আধুলি আর দীপুর কাছে সিকি আছে।'

ঠিক মিলে গেছে। ওরা দুজনেই অবাক।

রাঙাদা এদিকে ফিরে বলল, 'ব্যাপারটা বুঝলে অবাক হবার কিছু থাকবে না। জোড় কি বিজোড় যে-কোনো সংখ্যাকে জোড় সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে গুণফলটা জোড় সংখ্যা হবেই। কাজেই দীপুর গুণফল একটা জোড় সংখ্যা, কারণ দীপুকে আমি জোড় সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে বলেছি। জোড় সংখ্যার সঙ্গে আর একটা জোড় সংখ্যা যোগ দিলে যোগফলটাও জোড় সংখ্যা হয় আর বিজোড় সংখ্যা যোগ দিলে যোগফলটা বিজোড় হয়। তাদের যোগফলকে দুই দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষ নেই শুনে আমি বুঝলাম যোগফলটা একটা জোড় সংখ্যা। কাজেই গৌতমের গুণফলও নিশ্চয়ই জোড় সংখ্যা। তাহলে গৌতম নিশ্চয়ই জোড় সংখ্যা ধরেছে কারণ ওকে আমি বিজোড় সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে বলেছি, জোড়কেই বিজোড় দিয়ে গুণ করলে জোড় হয়। আর যার কাছে আধুলি তাকেই আমি জোড় সংখ্যা ধরতে বলেছি। এইভাবে বুঝলাম আধুলিটা গৌতমের কাছে আছে। তাহলে সিকি নিয়েছে দীপু।'

রাঙাদা থামল। দীপু আর গৌতম ব্যাপারটা আবার মিলিয়ে দেখল।

গৌতমের কাছে আধুলি, ও ধরেছে ৮, (জোড়) দীপুর কাছে সিকি, ও ধরেছে ৫ (বিজোড়)। দীপু গুণ করল ১২ (জোড়) দিয়ে আর গৌতম ৯ (বিজোড়) দিয়ে।

৫ × ১২ = ৬০, ৮ × ৯ = ৭২ ; ৬০ + ৭২ = ১৩২ (জোড় সংখ্যা)

১৩২-কে ২ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায়, ভাগশেষ থাকে না।

সোজা কথায়ঃ ২ দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষ নেই জানলেই বুঝতে হবে যাকে বিজোড় সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে বলা হয়েছে তার কাছে আধুলি, আর ভাগশেষ থাকলে উল্টোটা হবে।

আধুলি সিকি ছাড়া অন্য যে-কোনো দুটো জিনিস নিয়েও এই খেলাটা দেখানো যায়।

ওল্টানো সংখ্যার ম্যাজিক

'অমন করে কী দেখছিস, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আয়।' বাবা তাড়া দিল গৌতমকে।

বাবার সঙ্গে সেদিন রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল গৌতম। রাস্তার এপারে এসে সুন্দর করে সাজানো একটা ঘড়ির দোকানের সাইনবোর্ডের ওপর চোখ পড়তেই ও একটু অবাক হলো যেন। দোকানটার নম্বর লেখা রয়েছে ৩২১। এমনিতে অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু রাস্তা পার হবার ঠিক আগে উল্টোদিকের ঠিক ঐরকম একটা ঘড়ির দোকান দেখে এসেছে সাইনবোর্ডে বড়ো বড়ো করে দোকানের নম্বর লেখা ১২৩—এই দোকানের নম্বরটাকে উল্টে দিলে যা হয়।

এরকম ব্যাপার চট করে দেখা যায় না। রাস্তার এপারে ওপারে একই রকম দোকান আর নম্বর একটা আর একটার ঠিক উল্টো। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গৌতম ভাবে।

এর মধ্যে কোনো মজা লুকিয়ে আছে কি-না কে জানে! গৌতম মনে মনে ভাবল রাঙাদাকে বলতে হবে ব্যাপারটা। রাঙাদা তো অংক নিয়ে অনেক মজার মজার জিনিস জানে, নিশ্চয়ই এ নিয়ে নতুন কিছু শোনাবে।

সন্ধ্যের সময় রাঙাদার সঙ্গে দেখা হতে গৌতম ব্যাপারটা বলল। রাঙাদা শুনেই বলল, তিন অংকের এরকম ওলটানো সংখ্যা নিয়ে ম্যাজিকের মতো হয়, এটা আমি নিজেই একদিন বলব ভেবেছিলাম। যাক, তুই আজ বলাতে ভালোই হলো। যা, কাগজ পেন্সিল নিয়ে আয়।'

এর মধ্যে দীপু এসে ঘরে ঢুকল।

গৌতম কাগজ পেন্সিল নিয়ে আসতেই রাঙাদা বলল—'তুই দোকানের যে-নম্বর দুটোর কথা বললি, তার প্রথমটা থেকে দ্বিতীয়টা বিয়োগ করে বিয়োগফল যা হবে তার সঙ্গে ঐ বিয়োগফলেরই

ওল্টানো সংখ্যাটা যোগ করলে যোগফল ১০৮৯ হবে। মিলিয়ে দেখ।
গৌতম কাগজে প্রথমে বিয়োগ করে দেখল—

৩২১
১২৩
———
১৯৮

বিয়োগফল ১৯৮, এটাকে উল্টে দিলে হয় '৮৯১, এই দুটো সংখ্যা আবার যোগ করলে—

১৯৮
৮৯১
———
১০৮৯

রাঙাদার কথা মিলে গেল।

রাঙাদা গৌতমের হাত থেকে কাগজ নিয়ে একবার চোখ বোলাল তারপর বলল—'আরেকটা জিনিস লক্ষ্য কর, ৩২১ আর ১২৩-এর বিয়োগফল।

'১৯৮ কে, ১১ আর ৯৯ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যাবে।'

'আচ্ছা দোকান দুটোর নম্বর ৩২১ আর তার ওল্টানো সংখ্যা না হয়ে যদি অন্য কোনো সংখ্যা, যেমন ধরো ৪০১ আর তার ওল্টানো সংখ্যা ১০৪ হতো তাহলে? তাহলেও কি এরকম হবে?

'করে দেখলেই পারিস, হয় কি-না। তিন অংকের যে-সংখ্যাই নিস না কেন, সংখ্যাটাকে উল্টে, ওলটানো সংখ্যা আর নেয়া সংখ্যা এর মধ্যে যেটা বড়ো তা থেকে ছোটটা বিয়োগ করে বিয়োগফলের সঙ্গে বিয়োগফলেরই ওলটানো সংখ্যা যোগ করলে যোগফল ১০৮৯ হবেই। এইটাই ম্যাজিক। আর ঐ যে বিয়োগফল, তাকে ৯, ১১ ৯৯ দিয়ে ভাগ করলে মিলবেই।

দীপু এতক্ষণ দেখছিল। এবার ও কাগজ পেন্সিল হাতে নিয়ে দুটো আলাদা সংখ্যা বেছে নিল তারপর সংখ্যাগুলোকে উল্টে নিয়ে রাঙাদার কথামতো যোগ বিয়োগ করল—

৭০৩
(বিয়োগ) ৩০৭
৩৯৬
(যোগ) ৬৯৩
১০৮৯

৮১৭
(বিয়োগ) ৭১৮
০৯৯
(যোগ) ৯৯০
১০৮৯

(দু জায়গায়ই বিয়োগফল ৩৯৬ আর ৯৯ কে ৯, ১১, ৯৯, দিয়ে ভাগ করলে মিলবে।)

রাঙাদা কাগজটার ওপর চোখ রেখে বলল—'আর একটা মজার ব্যাপার আছে লক্ষ্য করেছিস?'

কাগজে চোখ রেখে দীপু কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর মাথা নাড়ল। মানে. ঠিক বুঝতে পারছে না।

'বিয়োগফলে মধ্যিখানের অংক সবসময় ৯, দু-পাশের অংক দুটোর যোগফলও ৯, এজন্যেই দু-পাশের অংক দুটোর যে-কোনো একটা জানলে বিয়োগফলটা না দেখেই বলে দেয়া যায়।'

'বুঝেছি বুঝেছি,' রাঙাদাকে থামিয়ে দিয়ে গৌতম বলে উঠল, 'ডান পাশের অংকটা ৬ জানলে বাঁ পাশের অংকটা তক্ষুনি বলা যায় ৯ বিয়োগ ৬, মানে ৩ মধ্যিখানের অংক তো জানাই আছে ৯, কাজেই ৯ বিয়োগফলটা না দেখেও বলে দেওয়া যায় ৩৯৬।'

'ভেরি গুড।' রাঙাদা গৌতমের পিঠ চাপড়ে দিল।

রাঙাদা বলল, টাকা পয়সার বেলায়ও এরকম ম্যাজিক হয়! যেমন ধর ৫৭ টাকা ৩০ পয়সা। টাকার সংখ্যা আর পয়সার সংখ্যা জায়গা বদলাবদলি করলে দাঁড়ায় ৩০ টাকা ৫৭ পয়সা। এবার এই দু-টোর বিয়োগফলের সঙ্গে বিয়োগফলেই আগের মতো জায়গা বদলাবদলি করে যা হয় সেটা যোগ দিলে ৯৯ টাকা ৯৯ পয়সা হবে। এটা হবেই। তবে হ্যাঁ, শুরুতে যেটা নিবি সেটা ১০০ টাকার কম হওয়া চাই।'

দীপু কাগজে যোগ বিয়োগ করে দেখল ঠিক হয় কি-না—

	টাকা	পয়সা	টাকা	পয়সা
	৫৭	৩০	৯৮	০৭
(বিয়োগ)	৩০	৫৭	৭	৯৮
	২৬	৭৩	৯০	০৯
(যোগ)	৭৩	২৬	৯	৯০
	৯৯	৯৯	৯৯	৯৯

শেষমেষ ৯৯ টাকা ৯৯ পয়সাই হচ্ছে।

(পাউণ্ড, শিলিং, পেনি, কিলোগ্রাম-এর বেলায়ও এ ধরণের ব্যাপার ঘটে।)

[একটা সাদা কাগজ ভিজিয়ে মসৃণ জায়গায় রেখে শুকনো কাগজ চাপিয়ে পেন্সিল দিয়ে চেপে ঐ যোগ-বিয়োগের ফলটা (যেটা আগেই জানা) লিখে শুকনো কাগজটা সরিয়ে নিচের কাগজটা শুকিয়ে নিয়ে রেখে দিয়ে পরে জলে ভেজালে চাপ দিয়ে লেখা সংখ্যাটা ফুটে উঠবে। আগে সুবিধে মতো সময় শুকিয়ে রেখে পরে ম্যাজিক দেখাবার সময় শুরুতেই ভিজিয়ে নিয়ে সংখ্যাটা আগেই দেখিয়ে সবাইকে অবাক করে দেয়া যায়।]

ওল্টানো সংখ্যার আরো মজা

(১) '১৩ কে ১২ দিয়ে গুণ করলে কতো হয়?'

গৌতম চট করে গুণ করে ফেলল, গুণফলটা জানাল : ১৫৬।

'এবার ১৩ আর ১২ কে উল্টে দিয়ে যে-দুটো সংখ্যা হয় সে-দুটোর গুণফল কতো হয়?'

তার মানে ৩১ আর ২১ এর গুণফল বার করতে হবে। গুণফল বার করে হলো ৬৫১।

'এটা আগের গুণফলের ঠিক উল্টো। সংখ্যা দুটো উল্টে দেওয়াতে গুণফলও উল্টে গেল। এরকম কিছু সংখ্যার মজাই এই। আরো দ্যাখ— রাঙাদা লিখে দেখাল :

৩১২ × ২২১ = ৬৮৯৫২

উল্টে দিয়ে— ২১৩ × ১২২ = ২৫৯৮৬

(২) '১২-র বর্গ কতো হয়?' রাঙাদা দীপুর দিকে তাকাল।

এ আর এমন কী। ১২-র বর্গ মানে ১২ কে ১২ দিয়ে গুণ। ও-তো মুখস্তই আছে, করার দরকার হয়না। দীপু জানাল— ১৪৪।

'১২ কে উল্টে দিলে কতো হয়?

'২১'

'২১-এর বর্গ কতো?,

'৪৪১,' দীপু গুণ করে জানাল।

'এই সংখ্যাটা ১২ র যা বর্গ হয়েছিল, মানে, ১৪৪—ঠিক তার উল্টো।'

'এরকম আরো কয়েকটা বলো।'

রাঙাদা কাগজে লিখে দেখাল—

১৩র বর্গ ১৬৯ আবার ৩১-এর বর্গ ৯৬১

১০২-এর বর্গ ১০৪০৪ আবার ২০১-এর বর্গ ৪০৪০১

১০৩-এর বর্গ ১০৬০৯ আবার ৩০১-এর বর্গ ৯০৬০১

১১২-এর বর্গ ১২৫৪৪ আবার ২১১-এর বর্গ ৪৪৫২১

১১৩-এর বর্গ ১২৭৬৯ আবার ৩১১-এর বর্গ ৯৬৭২১

১২২-এর বর্গ ১৪৮৮৪ আবার ২২১-এর বর্গ ৪৮৮৪১

প্যালিনড্রোম

'কারু কারু নাম বেশ মজার হয় জানিস,' রাঙাদা বলল—'সেদিন রাস্তা দিয়ে যাবার সময় একটা দোকানের সামনে এসে চোখ আটকে গেল। দোকানের ছোট সাইনবোর্ডে মালিকের নাম লেখা রয়েছে: রমাকান্ত কামার। নামটা মজার তাই না?'

হ্যাঁ, নামটা ডানদিক থেকে পড়লেও একই নাম দাঁড়ায়,' দীপু বলল। গৌতম সঙ্গে সঙ্গে যেন লাফিয়ে উঠল, 'আমাদের ক্লাশে ঐ রকম একটা ছেলে আছে। ওর নাম সুবল বসু। আমরা ওকে বলি, তোর নামটা উল্টো করে লিখলেও চলে।'

রাঙাদা হাসল, 'এরকম নাম আরো হয়। সদানন্দন দাস নামটাও এইরকম। এসব নামের মজাই এই, বাঁদিক কি ডানদিক—যেদিক থেকেই পড়িস নামটা একই থাকে। ইংরেজিতে একে বলে প্যালিনড্রোম। যতদূর জানি এর উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ নেই। সংখ্যার বেলায় এরকম সংখ্যা অনেক হতে পারে। তবে সবগুলোর মধ্যে যে সেরকম মজা আজে তা নয়, কয়েকটা বেশ মজাদার। যেমন ধর, ১২১; এই সংখ্যাটা ১১ কে ১১ দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায়, মানে ১২১ সংখ্যাটা ১১-র বর্গ। ১২১ আর ১১ দুটো সংখ্যাই কিন্তু বাঁ দিক থেকে পড়লে বা ডানদিক থেকে পড়লেও তাই। এরকম আরো ছাখ—'

রাঙাদা কাগজে লিখে দেখাল—

১১১-এর বর্গ ১২৩২১

১১১১-এর বর্গ ১২৩৪৩২১

১১১১১-এর বর্গ ১২৩৪৫৪৩২১

এই রকমভাবে পর পর চলবে

১২৩৪৫৬৭৯ সংখ্যাটা নিয়ে মজার ব্যাপার ঘটে। সংখ্যাটা নিজে যদিও প্যালিনড্রোম নয় কিন্তু সংখ্যাটাকে ৯, ৯৯, ৯৯৯ এধরণের সংখ্যা

দিয়ে গুণ করলে গুণফলগুলো প্যালিনড্রোম হয়। করেই ছ্যাখ না, —রাঙাদা দীপুর দিকে কাগজ পেন্সিল এগিয়ে দিল।

দীপু ছুটো মাত্র গুণ করে দেখল ব্যাপারটা মেলে কি-না—

১২৩৪৫৬৭৯	১২৩৪৫৬৭৯
× ৯৯৯	× ৯৯৯৯৯৯৯৯
১২৩৩৩৩৩৩২১	১২৩৪৫৬৭৮৮৭৬৫৪৩২১

ছুটো গুণফলের বেলায়ই বাঁদিক থেকে পড়লে যা ডানদিক থেকে পড়লেই তাই।

রাঙাদা বলল—'আরেকটা মজার ব্যাপার হলো—১২৩৪৫৬৭৯ সংখ্যাটাকে ৯ দিয়ে গুণ করলে পর পর নটা ১ পাওয়া যায়, ১৮ দিয়ে গুণ করলে পর পর নটা ২ পাওয়া যায়। এই ছ্যাখ — 'রাঙাদা কাগজে গুণ করে দেখাল—

১২৩৪৫৬৭৯	১২৩৪৫৬৭৯
৯	১৮
১১১১১১১১১	২২২২২২২২২

গৌতম এতক্ষণ খুব মন দিয়ে দেখছিল। ও বলল—তাহলে ২৭ দিয়ে গুণ করলে পর পর নটা ৩ আর ৩৭ দিয়ে গুণ করলে পর পর নটা ৪, ৪৫ দিয়ে গুণ করলে পর পর নটা ৫ হবে।'

ঠিক বলেছিস তো।' রাঙাদা খুব জোরে গৌতমের পিঠ চাপড়ে দিল।

সংখ্যা নিয়ে আরো মজা

(ক) রাঙাদা চোখ বুঁজে কী ভাবছে।

দীপু আর গৌতম বুঝল নিশ্চয়ই রাঙাদার মাথায় নতুন কোনো চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। রাঙাদা কিছু বলার আগেই দীপু কাগজ

পেন্সিল নিয়ে রেডি হয়ে গেল। দীপু জানে, কিছু লেখার ব্যাপার হলে রাঙাদা ওকেই আগে লিখতে বলবে।

চোখ খুলে দীপুর হাতে কাগজ পেন্সিল দেখেই রাঙাদা বলল, '৪৫ কে ৪৫ দিয়ে গুণ কর।'

'করেছি।'—দীপু গুণ করে বলল।

'কতো হলো?'

'২০২৫।'

'তার মানে পঁয়তাল্লিশের বর্গ হলো ২০২৫। চার অংকের এই সংখ্যাটার প্রথম দুটো অংক নিয়ে হলো ২০ আর শেষের দুটো অংক নিয়ে ২৫। মজা দ্যাখ, ২০ আর ২৫ যোগ করলে সেই পয়তাল্লিশ, যার বর্গ করেছিস।

'এরকম আর কোনো সংখ্যা আছে?'

'হ্যাঁ আছে। পঁয়তাল্লিশের বেলায় যেমন, ৫৫ আর ৯৯ এর বেলায়ও এরকম ব্যাপার ঘটে—

৫৫-র বর্গ ৩০২৫, আবার ৩০ আর ২৫ যোগ করলে ৫৫

৯৯-র বর্গ ৯৮০১, আবার ৯৮ আর ০১ যোগ করলে ৯৯

(খ) রাঙাদা বলল — আগেই দেখেছিস ১১ সংখ্যাটা প্যালিড্রোম, ওটার বর্গ করলে হয় ১২১ সেটাও প্যালিনড্রোম, বাঁ দিক থেকে পড়লে যা, ডান দিক থেকে পড়লেও তাই।

$$১১ \times ১১ = ১২১$$

আবার মজা দ্যাখ, এই ১২১ সংখ্যাটাকে এইভাবেও পাওয়া যায়—

$$\frac{২২ \times ২২}{১ + ২ + ১} = ১২১$$

একটু চুপ করে থেকে রাঙাদা দীপুর দিকে তাকায়, মজাটা কোথায় বুঝতে পেরেছিস?

দীপু বেশ কিছুক্ষণ কাগজটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল হ্যাঁ পেরেছি। ১২১--এর মধ্যিখানে আছে ২, এই ২ 'কে দুবার লিখে ২২

সংখ্যাটা পাওয়া যায়। ২২-এর বর্গকে ১২১-এর অঙ্ক গুলোর যোগ-ফল দিয়ে ভাগ করলেই ১২১ সংখ্যাটা ফিরে পাওয়া যায়।

গৌতম বলল, তাহলে ১২৩২১, ১২৩৪৩২১ সংখ্যাগুলোও এই নিয়মে পাওয়া যাবে ?

রাঙাদা বলল, নিশ্চয়। লিখেই দেখ না।

গৌতম আর একটা কাগজ নিয়ে লিখল—

$$\frac{৩৩৩ \times ৩৩৩}{১+২+৩+২+১} = ১২৩২১$$

$$\frac{৪৪৪৪ \times ৪৪৪৪}{১+২+৩+৪+৩+২+১} = ১২৩৪৩২১$$

এইভাবে চলবে।

(গ) ***৯-এর খেলা*** **:** রাঙাদা বলল জানিস, ৯কে নিয়ে অনেক মজার মজার খেলা তৈরী করা যায়। মানে ৯-এর মধ্যে অনেক মজা লুকিয়ে আছে।

যেমন, ৯ কে ৯ দিয়ে গুণ করে ২ যোগ করলে হয় ১১ ; ১২ দিয়ে গুণ করে ৩ যোগ করলে ১১১, আবার ১২৩ দিয়ে গুণ করে ৪ যোগ করলে ১১১১, এই রকম আর কী।

কলম দিয়ে কাগজে আঁকিবুকি করতে করতে রাঙাদা এই সব কথা বলছিল।

দীপু আর গৌতম বলল, ওরকম নয় ভালো করে লিখে দেখাও, বন্ধুদের দেখাতে হবে তো !

রাঙাদা ভালো করে লিখে দেখাল—

$$৯ \times ০ + ১ = ১$$
$$৯ \times ১ + ২ = ১১$$
$$৯ \times ১২ + ৩ = ১১১$$
$$৯ \times ১২৩ + ৪ = ১১১১$$
$$৯ \times ১২৩৪ + ৫ = ১১১১১$$

এইভাবে চলবে।

গৌতম বলল, এ যেন ম্যাজিক, যখন ২ যোগ করা হচ্ছে। তখন দুটো ১, যখন ৩ যোগ করা হচ্ছে তখন তিনটি ১, ৪ যোগের বেলায় চারটে ১। বেশ মজা তো!

(ঘ) ***৯-এর আরেক খেলা :***

এ-ও কতকটা আগের মতো!

৯ × ৯ + ৭ = ৮৮

৯ × ৯৮ + ৬ = ৮৮৮

৯ × ৯৮৭ + ৫ = ৮৮৮৮

৯ × ৯৮৭৬ + ৪ = ৮৮৮৮৮

: : : : : : : : : : :

৯ × ৯৮ ৬৫৪৩ + ১ = ৮৮৮৮৮৮৮৮

৯ × ৯৮৭৬৫৪৩২ + ০ = ৮৮৮৮৮৮৮৮৮

(ঙ) ***উনিশে মজা :*** সুকুমার রায়ের কবিতার সেই গঙ্গারামের কথা মনে আছে তো? চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে রাঙাদা বলে, সেই যে গঙ্গারাম যার বেজায় অধ্যবসায়, উনিশটি বার ম্যাট্রিকে ঘায়েল হয়ে শেষে থামে। কবিতার গঙ্গারামের কথা মনে হতেই ১৯ সংখ্যাটা নিয়ে একটা মাজার খেলা মনে পড়ে গেল।

গৌতম কাগজ কলম নিয়ে আগেই রেডি হয়ে ছিল, রাঙাদা ওর হাত থেকে নিয়ে লিখে দেখাল।

১৯ × ১ = ১৯,	১ + ৯ = ১০,	১ + ০ = ১
১৯ × ২ = ৩৮,	৩ + ৮ = ১১,	১ + ১ = ২
১৯ × ৩ = ৫৭,	৫ + ৭ = ১২,	১ + ২ = ৩
....		
১৯ × ৯ = ১৭১,	১৭ + ১ = ১৮,	১ + ৮ = ৯
১৯ × ১০ = ১৯০,	১৯ + ০ = ১৯,	১ + ৯ = ১০

এখানে ১৯-এর গুণিতক প্রথমটায় ১, দ্বিতীয়টায় ২, এইভাবে চলতে চলতে সব শেষেরটায় গুণিতক ১০।

এবার গুণফলের দিকে তাকানো যাক। প্রথম গুণফল ১৯, এতে দুটো অংক ১ আর ৯, এদের যোগফল ১০, আবার ১০-এর দুটো অংক, ১ আর ০, এদের যোগফল ১।

দ্বিতীয় সারির দিকে তাকাই। গুণফল ৩৮, এর অংক দুটোর যোগফল ১১ আবার এরও অংক দুটোর যোগফল ২ (১ + ১)।

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে গুণফলের অংকগুলির যোগফল ১০, ১১, ১২,····এইভাবে পর পর আছে। আবার এই যোগফলের অংকগুলো যোগ করলে সেই যোগফলও ১, ২, ৩·······এইভাবে পর পর পাওয়া যাচ্ছে। মজাটা ঐখানেই।

(চ) মজার সংখ্যা ১০৮৯

রাঙাদা অনেকক্ষণ থেকে আসন গেড়ে চোখ বুঁজে বসে আছে। মুখে কোনো কথা নেই। একেবারে চুপচাপ।

গৌতম দীপুর দিকে তাকাল, রাঙাদা ধ্যান করছে নাকি?

দীপু জানে ওটা রাঙাদার একটা স্টাইল। নতুন কিছু ভাববার সময় রাঙাদা ঐ ভাবে বসে মৌন অবলম্বন করে। ও বলল, নারে, মনে হচ্ছে রাঙাদা বোধ হয় সংখ্যা নিয়ে মজাদার আরো কিছু বলবে।

বলতে না বলতেই রাঙাদা চোখ খুলল।

দীপু আর গৌতম হাঁ করে তাকিয়ে রইল, রাঙাদা কী বলে তার জন্য অপেক্ষা করে রইল।

রাঙাদা বলল, তোদের ১০৮৯ সংখ্যাটার কথা মনে আছে?

১০৮৯? দীপু কয়েক সেকেণ্ড ভাবল, তারপর বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে।

গৌতম বলল,আমারও মনে পড়েছে।

মনে পড়া তো উচিত। মাত্র সেদিনই এই সংখ্যাটার কথা উঠেছিল।

দীপু বলল, তিন অংকের কোনো সংখ্যা আর তার ওল্টানো সংখ্যার

বিয়োগফল যা হয় তার সঙ্গে বিয়োগফলেরই ওল্টানো সংখ্যা যোগ করলে যোগফল হবে ১০৮৯।

ভেরি গুড। রাঙাদা দীপুর পিঠ চাপড়ে দিল।

দীপু চট করে কাগজ নিয়ে লিখে দেখল ঠিক মনে আছে কিনা—

৬৯২	৩৯৬
২৯৬	৬৯৩
(বিয়োগ) ৩৯৬	(যোগ) ১০৮৯

এই ১০৮৯ কে ১ থেকে ৯ অবধি সংখ্যাগুলো দিয়ে পর পর গুণ করলে গুণফলগুলো আমাদের বেশ অবাক করে। অবাক যেমন করে মজাও দেয় তেমনি

১০৮৯ × ১ = ১০৮৯
× ২ = ২১৭৮
× ৩ = ৩২৬৭
× ৪ = ৪৩৫৬
× ৫ = ৫৪৪৫
× ৬ = ৬৫৩৪
× ৭ = ৭৬২৩
× ৮ = ৮৭১২
× ৯ = ৯৮০১

গুণফলগুলোর পরস্পরের মধ্যে মিল আছে বেশ। গুণফলে সবচাইতে বাঁ দিকের অংক প্রথমটায় ১, দ্বিতীয়টায় ২, তৃতীয়তে ৩, এইভাবে পর পর আছে। তারপরের অংক শুরু হয়েছে শূন্য থেকে শেষ হয়েছে ৮-এ। সবচাইতে ডান দিকের অংক আবার শুরু হয়েছে ৯ দিয়ে, পর পর নেমে শেষ হয়েছে ১-এ।

গৌতম এতক্ষণ মন দিয়ে সবকিছু লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ ওর চোখ দুটো চকচক করে উঠল, রাঙাদা আমি আর একটা মজার জিনিস দেখতে পাচ্ছি।

রাঙাদা কিছু না বলে উৎসুক চোখে তাকিয়ে রইল।

গৌতম আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, প্রথম গুণফল ১০৮৯ আর শেষ গুণফল ৯৮০১ একটা আর একটার উল্টো। একটাকে উল্টে দিলেই অন্যটা পাওয়া যায়।

গৌতমের মাথায় ছোট একটা টোকা মেরে রাঙাদা বলল, তোর মাথায় কিছু নেই বলেই আগে ভাবতাম। এখন দেখছি তোর বুদ্ধিটা বেশ খুলেছে। তা তুই যেটা বললি সেটা শুধু প্রথম আর শেষ গুণফলের বেলায়ই নয়, দ্বিতীয় গুণফলের ২১৭৮ আর অষ্টম গুণফলের বেলায়ও এরকমটি হবে। একটা আর একটার উল্টো।

দীপু এতক্ষণ চুপ করে ছিল, ও বলল তৃতীয় আর সপ্তম গুণফলও তো ঐরকম। চতুর্থ আর ষষ্ঠ গুণফলও তাই।

ঠিক তাই। আর মধ্যিখানের সংখ্যা, মানে পঞ্চম গুণফল? রাঙাদা বলল, লক্ষ্য করে দেখ, ওটা প্যালিনড্রোম, উল্টো করে লিখলে ঐ সংখ্যাটাই থেকে যায়।

(ছ) *প্যালিনড্রোমের আরেক মজা :*

প্যালিনড্রোমের কথা যখন আবার উঠল আমার আর একটা জিনিস মনে পড়ে গেল, রাঙাদা বলল, আগে সেটা বলা হয়নি।

তার মানে বাদ পড়ে গিয়েছিল? গৌতম প্রায় লাফিয়ে উঠল, ইস্, বড্ড মিস হয়ে যাচ্ছিল। ভাগ্যিস তোমার মনে পড়ল রাঙাদা।

শোন, ১২১ সংখ্যাটা মনে আছে নিশ্চয়ই। উল্টো করে লিখলেও সংখ্যাটা একই থাকে। এখন কথা হলো ১২১ এ তিনটি অংক ১, ২, ১ এদের যোগফল কত? ৪, লক্ষ্য করে দেখ এটা মধ্যিখানের অংক ২-এর বর্গ।

১২৩২১ সংখ্যাটাও ঐরকম। উল্টো করে লিখলে একই থাকে, আবার এর অংকগুলোর যোগফল ৯, মধ্যিখানের অংক ৩-এর বর্গ।

$$১+২+১=২^২$$

$$১+২+৩+২+১=৩^২$$

$$১+২+৩+৪+৩+২+১=৪^২$$

এই ধরনের যে কোনো সংখ্যার বেলায়ই এটা হবে। আর একটা—

$$১+২+৩+৪+৫+৬+৭+৮+৭+৬+৫+৪+৩+২+১=৮২$$

(জ) ***অবাক করা বর্গ*** : পর পর কতকগুলো সংখ্যা আছে যার কয়েকটার বর্গের যোগফল বাকিগুলোর বর্গের যোগফলের সমান।

যেমন ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ; প্রথম তিনটের বর্গের যোগফল বাকি দুটো সংখ্যার বর্গের যোগফলের সমান। মানে—

$$১০^২+১১^২+১২^২=১৩^২+১৪^২$$

এরকম আরো আছে—

$$৩^২=৪^২=৫^২$$

$$২১^২+২২^২+২৩^২+২৪^২=২৫^২+২৬^২+২৭$$

$$৩৬^২+৩৭^২+৩৮^২+৩৯^২=৪০^২+৪১^২+৪২^২+৪৩^২+৪৪^২$$

$$৫৫^২+৫৬^২+৫৭^২+৫৮^২+৫৯^২+৬০^২=৬১^২+৬২^২+৬৩^২+৬৪^২+৬৫^২$$

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে বাঁ দিকে বর্গ সংখ্যা যতো, ডানদিকে ঠিক ততো নয়, একটা কম।

পঁয়তাল্লিশের ম্যাজিক

'পঁয়তাল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বিয়োগ করলে কতো হয়?'

হঠাৎ রাঙাদার এ প্রশ্ন শুনে দীপু আর গৌতম দুজনেই বেশ হকচকিয়ে গেল। এ আবার কেমনধারা প্রশ্ন। যে-কোনো সংখ্যা থেকে সেই সংখ্যাই বিয়োগ করলে বিয়োগফল যে শূন্য হয় এ-তো সবাই জানে। ক্লাশ টু-পড়া রিনকিও জানে। দীপু আর গৌতমকে অন্ততঃ এরকম একটা সাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার কোনো মানেই হয় না। তবু জিজ্ঞেস যখন করেছে, উত্তরটা দিতেই হয়। দীপু

সোজা হয়ে বলল, 'কেন, পঁয়তাল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বিয়োগ করলে কিছুই থাকে না, মানে শূন্য হয়!'

রাঙাদা মুচকি হাসল, 'আমি কিন্তু দেখাতে পারি, পঁয়তাল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বিয়োগ করলে পঁয়তাল্লিশই থাকে।'

বলে কী রাঙাদা? বিয়োগ করার নিয়ম কি পাল্টে গেল না-কি? ওরা এতদিন যা জেনে এসেছে তা-কি এখন ভুল হয়ে গেল? কেমন যেন সব গোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

দীপু আর গৌতমের অবাক হওয়া লক্ষ্য করে রাঙাদা একটা কাগজ আর কলম নিয়ে লিখতে লিখতে বলল, '১ থেকে ৯, এই নটা সংখ্যার যোগফল হয় ৪৫; সংখ্যা ন'টাকে দুবার দুভাবে সাজিয়ে যোগ করে একটার নিচে আর একটা রেখে ওপরের সারি থেকে নিচের সারি বিয়োগ করলে আবার ঐ নটা সংখ্যাই পাওয়া যায় এবং সেগুলোর যোগফলও ঐ পঁয়তাল্লিশ। এই দেখ—'বলে রাঙাদা লেখা শেষ করে কাগজটা দেখাল—

$$
\begin{array}{r}
৯+৮+৭+৬+৫+৪+৩+২+১=৪৫ \\
১+২+৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯=৪৫ \\
\hline
৮+৬+৪+১+৯+৭+৫+৩+২=৪৫
\end{array}
$$

বিয়োগ করার বেলায় ওপরের সারিকে আটানব্বুই কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ চুয়ান্ন হাজার তিনশো একুশ আর নিচের সারিকে বারো কোটি চৌত্রিশ লক্ষ ছাপান্ন হাজার সাতশো উননব্বুই মনে করতে হবে। মানে বিয়োগ করার সময় যোগ চিহ্নগুলো নেই মনে করতে হবে।

'তাহলে দেখলি তো কেমন করে পঁয়তাল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বিয়োগ করে পঁয়তাল্লিশ পাওয়া যায়! অবিশ্যি এটা কায়দা করে পাওয়া।'

দীপু বলল, 'পঁয়তাল্লিশের বেলায় তো এরকম হলো, অন্য কোনো সংখ্যা নিয়ে এরকম দেখাও তো।'

'ছত্রিশের বেলায়ও এরকম দেখানো যায়। এই দেখ—'বলে রাঙাদা কাগজের ওপর লিখতে লাগল। দীপু আর গৌতম ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল—

৮ + ৬ + ৭ + ৪ + ৫ + ২ + ৩ + ১ = ৩৬

১ + ৩ + ২ + ৫ + ৪ + ৭ + ৬ + ৮ = ৩৬

---

৭ + ৩ + ৪ + ৯ + ০ + ৪ + ৬ + ৩ = ৩৬

১ থেকে ৮, এই আটটা সংখ্যার যোগফল ৩৬; পঁয়তাল্লিশের বেলায় যেমন, এখানেও তেমন আটটা সংখ্যাকে প্রথম লাইনে যেভাবে সাজালাম, দ্বিতীয় লাইনে ঠিক তার উল্টোভাবে সাজালাম। তবে এখানে একটা তফাৎ হলো সংখ্যা আটটাকে ঠিক পর পর সাজানো হলো না, একটু এদিক-ওদিক করে নেওয়া হলো, এই আর কী!

মজার ছক

গৌতম যেন রেডি হয়েই ছিল। রাঙাদা বাড়ি ফিরতেই ও হাতে একটা কাগজ তুলে ধরে নাড়াতে নাড়াতে রাঙাদার কাছে এগিয়ে এল।—' এই দেখো, একটা মজার খেলা শিখেছি ইস্কুলের এক বন্ধুর কাছ থেকে।'

রাঙাদা কৌতূহল মাখানো চোখ নিয়ে কাগজটার দিকে তাকাল। কী এমন মজার খেলা শিখেছে ও যে রাঙাদা বাড়ি ফিরতে না ফিরতেই দেখাবার জন্যে ছুটে এসেছে।

'আমাকে শিখিয়ে দিবি তো?' জামাটা খুলতে খুলতে রাঙাদা বলল। 'আগে চেষ্টা করে দেখো, না পারলে দেখিয়ে দেবো, গৌতম বিজ্ঞের ভঙ্গিতে বলল।'

'তা খেলাটা কী শুনি।'

গৌতমের হাতে ধরা কাগজটার এক পিঠে কী যেন লেখা, উল্টো পিঠটা সাদা! ও উল্টো পিঠটা রাঙাদার সামনে মেলে ধরে তাতে

নটা খোপ কাটল।—তিনটে সারি, প্রত্যেক সারিতে তিনটে করে খোপ। তারপর রাঙাদাকে বলল, ঐ নটা খোপে এক থেকে নয়, এই নটা সংখ্যা বসাতে। কোনো সংখ্যা একটার বেশি খোপে বসানো চলবে না। সংখ্যাগুলো এমনভাবে বসাতে হবে যাতে যে কোনো সারির তিনটে সংখ্যা যোগ করলে পনেরো হয়। শুধু সারি নয়, ওপরে-নিচে কিংবা কোণাকুণি যোগ করলেও পনেরো।

রাঙাদা মুচকি হাসল, 'ও, এই কথা!' তারপর একটা কপট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আচ্ছা, দেখি চেষ্টা করে, হয় কি-না।'

পেন্সিলটা কপালে ঠেকিয়ে কিছু যেন চিন্তা করছে এইভাবে রাঙাদা কয়েক সেকেণ্ড ভুরু কুঁচকে রইল। তারপর আস্তে আস্তে নটা খোপে এক থেকে নয়, এই নটা সংখ্যা বসিয়ে গৌতমকে বলল, 'ছাখ তো ঠিক হয়েছে কি-না।'

৮	১	৬
৩	৫	৭
৪	৯	২

১ম সারি : ৮ + ১ + ৬ = ১৫
২য় সারি : ৩ + ৫ + ৭ = ১৫
৩য় সারি : ৪ + ৯ + ২ = ১৫
লম্বালম্বিভাবে : ৮ + ৩ + ৪ = ১৫
১ + ৫ + ৯ = ১৫
৬ + ৭ + ২ = ১৫
কোণাকুণিভাবে : ৮ + ৫ + ২ = ১৫
৬ + ৫ + ৪ = ১৫

ঠিক এই সময় দীপু এসে ঘরে ঢুকল। ঢুকেই রাঙাদাকে বলল, গৌতমকে কী শেখাচ্ছিলে, আমাকে শিখিয়ে দাও।'

'আমি শেখাচ্ছিলাম না, গৌতমই আমাকে শেখাচ্ছিল,' রাঙাদা মজা করে বলল।

দীপু কাগজটার উপর ঝুঁকে পড়ে দেখল, 'ও, এই খেলা! এটা আমি শিখে গেছি।'

'শিখেছিস তো আমার কাছেই,' গৌতম হঠাৎ বলে উঠল।

তা ঠিক। দীপু গৌতমের কাছেই খেলার কায়দাটা শিখেছে। গৌতম ওর এক বন্ধুর কাছ থেকে শিখে দীপুকে শিখিয়ে দিয়েছে খেলাটা। দীপু রাঙাদার কাছে সেটা চেপে যাওয়াতেই ওর আপত্তি।

রাঙাদা বলল, 'থাক, আর ঝগড়া করতে হবে না। তার চাইতে বরং মজার ছকের এইরকম খেলা আরো হয় কি-না দেখা যাক।'

দীপু আর গৌতম দুজনেই এবার নড়েচড়ে বসল।

রাঙাদা বলল, 'এই সব খেলা আজকের নয়, অনেক পুরনো। শোনা যায়, চীনদেশের এক রাজা একবার নদীর ধারে বেড়াবার সময় হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, তীর বরাবর একটা কচ্ছপ হেঁটে চলেছে, কচ্ছপটার পিঠে কতকগুলো সংখ্যা সাজানো। কৌতূহলী রাজা কাছে গিয়ে অবাক হয়ে দেখলেন সংখ্যাগুলো ডাইনে-বাঁয়ে, ওপরে-নিচে যেভাবেই যোগ করা যাক না কেন, যোগফল একই দাঁড়াচ্ছে। প্রাসাদে ফিরে রাজা এই অদ্ভুত ব্যাপারটা সব্বাইকে বললেন। তারপর নিজেই এই খেলায় মেতে উঠলেন। এটা আজ থেকে অনেকদিন আগের, বলতে পারিস, হাজার কয়েক বছর আগের কথা। এই যে একটু আগে যে-খেলাটা হচ্ছিল,—এক থেকে নয় অব্দি নটা সংখ্যা নটা খোপে বসিয়ে সবদিকের যোগফল পনেরো করা—এটা চীনদেশে খুবিই জনপ্রিয় ছিল।'

একটু থেমে রাঙাদা আবার বলল, 'একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখ, নটা সংখ্যা নিয়ে নটা খোপঅলা যে ছকটা তৈরী হয়েছে, সেই ছকটাকে নানাভাবে ঘুরিয়ে আরো গোটাকয়েক ছক তৈরী করা যায়। যেমন, এই দেখ—রাঙাদা তিনটে লিখে দেখাল—

৮ ৩ ৪	৪ ৯ ২	২ ৭ ৬
১ ৫ ৯	৩ ৫ ৭	৯ ৫ ১
৬ ৭ ২	৮ ১ ৬	৪ ৩ ৮

আগের মতোই, ডাইনে-বাঁয়ে, ওপরে-নিচে যেভাবেই যোগ করা যাক, যোগফল সেই পনেরো হচ্ছে।

'কিন্তু তুমি যে ছক নিয়ে আরো নতুন খেলার কথা বলছিলে !' দীপু যেন একটু অধৈর্য হয়ে উঠল।

'হ্যাঁ, এতক্ষণ তিন-তিন ছকের কথা বলছিলাম। তিন-তিন ছক, মানে যে ছকে তিনটে সারি, প্রত্যেক সারিতে তিনটে খোপ। এবার বলছি চার-চার ছকের কথা। এতে চারটে সারি, প্রত্যেক সারিতে চারটে খোপ। তার মানে মোট ষোলোটা খোপ। এই ষোলোটা খোপে এক থেকে ষোলো এই ষোলোটা সংখ্যা বসিয়ে সবদিকে যোগফল চৌত্রিশ করতে হবে। যে-কোনো সারির চারটে সংখ্যার যোগফল চৌত্রিশ, আবার লম্বালম্বি কি কোণাকুণি চারটে সংখ্যার যোগফলও চৌত্রিশ—।'

দীপু ততক্ষণ একটা কাগজে ছক কেটে ফেলেছে। কাগজের ওপর চোখ রেখেই ও বলল, 'কোনো সংখ্যা একবারের বেশি ব্যবহার করা চলবে না, আর কোনো খোপ খালি থাকবে না—তাইতো ?'

'ঠিক তাই।'

রাঙাদা দেখল দীপু খোপে একটার পর একটা সংখ্যা বসাচ্ছে আর মিলিয়ে দেখছে যোগফল চৌত্রিশ হয় কি-না। এইভাবে চলল অনেকক্ষণ! অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও যখন মিলল না তখন কাগজ থেকে মুখ তুলে রাঙাদার দিকে তাকাল—মানে, পারছি না, দেখিয়ে দাও।

রাঙাদা পকেট থেকে ছোট একটা কাগজ বার করতে করতে বলল, 'আমারও কি ছাই মুখস্ত আছে ? সেদিন একটা বইতে এই মজার ছক নিয়ে লেখা দেখছিলুম, তা থেকে কয়েকটা জিনিস লিখে রেখেছি।'

রাঙাদা চার-চার ছক লিখে দেখাল—

দীপু আর গৌতম দুজনেই লক্ষ্য করে দেখল যোগফল সবদিকেই চৌত্রিশ হচ্ছে।

রাঙাদা বলল, 'আরো মজা দেখ। ওপরে ডান দিককার চারটে সংখ্যা—২, ১৩, ৮, ১১ নিলে তার যোগফলও সেই চৌত্রিশ।

যে-কোনো কোণের দিককার চারটে সংখ্যার বেলাতেই এটা হবে। আবার মধ্যিখানের চারটে সংখ্যা—১০,১১ ৭, ৬-এর যোগফল কতো? —সে-ও চৌত্রিশ। ঠিক এই ছকটা প্রথম দেখতে পাওয়া যায় এক নামকরা ছবি আঁকিয়ের একটা ছবিতে। ছবিটা আঁকা হয় ১৫১৪

১৬	৩	২	১৩
৫	১০	১১	৮
৯	৬	৭	১২
৪	১৫	১৪	১

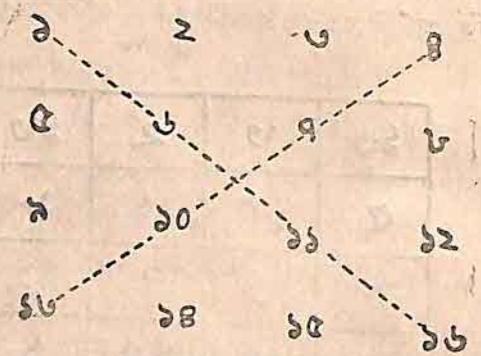
সালে। ছকটায় একেবারে নিচের সারির মাঝের দুটো সংখ্যা দিয়ে এই সালটাকেই বোঝানো হয়েছে।

দীপু ভাবছিল বন্ধুদের এটা দেখিয়ে অবাক করবে। কিন্তু ও দেখল ছকটা ঠিক ঠিক মনে রাখা সোজা নয়। কাগজে টুকে রাখা অবিশ্যি যায়, কিন্তু বন্ধুদের কাছে খেলা দেখাবার সময় কাগজ দেখে দেখে লিখতে হলে খেলার আসল মজাটাই নষ্ট হয়ে যায়। তার চাইতে ছকটা মনে রাখার কোনো নিয়ম যদি থাকে তো সেটা শিখে নিলেই সুবিধে।

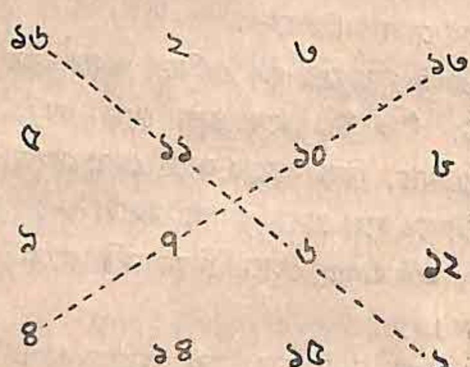
রাঙাদা বলল, 'চার চার ছক কতরকমভাবে তৈরী করা যায় জানিস?—আটশো আশি রকম ভাবে। ছককে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উল্টে পাল্টে ধরে, মানে সারিগুলোকে স্তম্ভ আর স্তম্ভগুলোকে সারি হিসেবে ধরলে—যেমন তিন-তিন ছকের বেলায় ধরা হয়েছিল—আরো অনেক ভাবে চার-চার ছক তৈরী করা যায়। সবগুলোর বেলায় কিন্তু যোগফল সেই চৌত্রিশ। একটা সোজা নিয়ম শিখিয়ে দিই—।

চার-চার ছক তৈরী করার নিয়ম

নিয়মটা খুবই সোজা। প্রথমে ১ থেকে ১৬ এই ষোলোটা সংখ্যা চার সারিতে পর পর লিখে যেতে হবে [(ক)-এ যেমন দেখানো হয়েছে] তারপর কোণাকুণি দুটো লাইন বরাবর যে সংখ্যাগুলো



(ক)



(খ)

আছে সেগুলোকে উল্টে সাজালেই হলো। যেমন ওপরে বাঁ দিক থেকে নিচে ডান দিক অব্দি যে লাইনটা তাতে আছে ১, ৬, ১১, ১৬, উল্টে লিখলে হয় ১৬, ১১, ৬, ১ ; বাকী কোণাকুণি লাইন বরাবর সংখ্যা-গুলোকেও এইভাবে উল্টে লেখা হলো। অন্য সব সংখ্যাগুলো যেমন

ছিল তেমনই রইল। এইভাবে যে ছকটা পাওয়া গেল [(খ)] সেটা একটা মজার ছক—যেদিক দিয়ে যোগ করা যাক, যোগফল চৌত্রিশ। এর সারি আর স্তম্ভগুলোকে নানাভাবে সাজিয়ে আরো অনেকরকম ছক পাওয়া যায়। যেমন দ্বিতীয় আর তৃতীয় স্তম্ভদুটোকে জায়গা পাল্টাপাল্টি যে ছকটা হয় সেটাই গোড়াতে তোদের লিখে দেখিয়েছিলাম। মিলিয়ে দেখ।'

দীপু এতক্ষণ মন দিয়ে দেখছিল। ও এইবার মুখ খুলল, 'ছকটা সাজানোর নিয়ম এভাবেও মনে রাখা যায়ঃ প্রথমে কোণাকুণি লাইন বরাবর জায়গাগুলো খালি রেখে বাকি সংখ্যাগুলো যার যার জায়গায় পর পর বসিয়ে গেলাম। তারপর একেবারে শেষ ঘর থেকে ১ দিয়ে শুরু করে সংখ্যা বসাতে লাগলাম শুধু খালি জায়গাগুলোতে। যেমন একেবারে শেষ ঘরে বসল ১ তারপর ২, ৩ বসার কথা, কিন্তু সেগুলো বসানো হলো না, কারণ ২ আর ৩-এর জায়গায় সংখ্যা দখল করে আছে ১৫ আর ১৪, তারপর ৪ বসল, কারণ ঐ জায়গাটা খালি আছে। ৫ বসল না, কারণ ঐ জায়গা দখল করে আছে ১২, তারপর পর পর দুটো খালি জায়গায় ৬, ৭ বসল। এইভাবে চলল।'

'একই ব্যাপার, যার যেভাবে মনে রাখতে সুবিধে।'

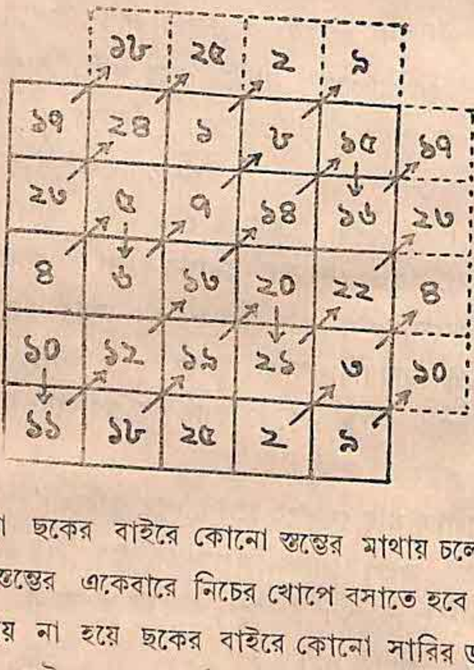
রাঙাদা লক্ষ্য করল গৌতম কাগজ পেন্সিল দিয়ে আপনমনে কী যেন মেলাবার চেষ্টা করছে। জিজ্ঞেস করতেই ও বলল, 'দেখছি পাঁচ-পাঁচ ছক এইভাবে হয় কি না।'

'এভাবে হবে না। পাঁচ-পাঁচ ছকের বেলায় অন্য নিয়ম। পাঁচ-পাঁচ, সাত-সাত, নয়-নয়, এইরকম সব বিজোড় ছক একই নিয়মে হয়।'

পাঁচ পাঁচ ছক তৈরী করার নিয়ম

'পাঁচ-পাঁচ ছকে পাঁচটা সারি আর পাঁচটা স্তম্ভ। মোট পঁচিশটা খোপ। ১ থেকে ২৫, এই পঁচিশটা সংখ্যা ঐ পঁচিশটা খোপে বসাতে হবে। এমনভাবে বসাতে হবে যাতে যোগফল সবদিকে পঁয়ষট্টি হয়।

এই ছক তৈরীর সময় প্রত্যেক সংখ্যার পরের সংখ্যা কোণাকুণি ভাবে ওপরের খোপে বসাতে হবে। এভাবে বসাতে গিয়ে যদি



কোনো সংখ্যা ছকের বাইরে কোনো স্তম্ভের মাথায় চলে যায় তাহলে সেটাকে ঐ স্তম্ভের একেবারে নিচের খোপে বসাতে হবে। আর যদি স্তম্ভের মাথায় না হয়ে ছকের বাইরে কোনো সারির ডানদিকে চলে যায় তাহলে সেই সংখ্যাকে ঐ সারির একেবারে বাঁ দিকের খোপে বসাতে হবে। ছকের বাইরে তো আর কোনো সংখ্যা বসানো চলবেনা।

১ দিয়েই শুরু করা যাক। ১-কে বসানো হলো প্রথম সারির মাঝের খোপে। ১-এর পর ২, ১-কে কোণাকুণিভাবে ওপরের দিকে বসাতে গেলে ছকের বাইরে, পাশের স্তম্ভের মাথায় চলে যায়, সেজন্যে ২-কে পাশের স্তম্ভের একেবারে নিচে বসানো হলো।

তারপরের সংখ্যা ৩ ; ৩-কে বসানো হলো কোণাকুণি ওপরের খোপে। এই নিয়মে বসাতে গিয়ে ৪ কিন্তু চলে গেল ছকের বাইরে, তৃতীয় সারির ডানদিকে। কাজেই ৪-কে ঐ তৃতীয় সারির একেবারে বাঁ দিকে লেখা হলো। ৪-এর পর ৫ বসল কোণাকুণি ওপরের খোপে। ৫-এর পর ৬ কোণাকুণি ওপরের খোপে বসার কথা, কিন্তু ঐ জায়গা আগেই দখল করে নিয়েছে ১, কাজেই ৬-এর জায়গা হলো ৫-এর ঠিক নিচের খোপে। ঠিক এই কারণেই ১১, ১০-এর নিচে আর ২১, ২০-র নিচে বসল। ১৬ বসল ১৫-র নিচে কারণ কোণাকুণি-ভাবে ওপরের দিকে বসাতে গেলে ১৬ ছকের বাইরে কোনো স্তম্ভের মাথায় কিংবা কোনো সারির ডান দিকে পড়ছে না।'

দীপু আর গৌতম দুজনেই খুব মন দিয়ে বাকি সংখ্যাগুলো লক্ষ্য করল। ১৬-র পর ১৭ বাইরে পড়ে গেল, কাজেই ১৭ চলে গেল একে-বারে উল্টোদিকে, মানে প্রথম সারির বাঁ দিকে, প্রথম খোপে আবার ১৮ দ্বিতীয় স্তম্ভের মাথা থেকে নেমে এল একেবারে নিচের খোপে।

দীপু বলল, 'এইবার বুঝে গেছি। পারবো।'

'ঠিক এই নিয়মেই সাত-সাত ছক করা যায়। করে দেখা তো, দেখি পারিস কিনা।'

দীপু কাগজ পেন্সিল হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে সাত-সাত ছক তৈরী করে ফেলল।

কাগজটা হাতে নিয়ে রাঙাদা ভালো করে দেখে বলল, 'এই তো, ঠিক হয়েছে। ভেরি গুড। কিন্তু প্রত্যেকটা সারি আর স্তম্ভের যোগফল কতো দেখেছিস ?'

'না, তা তো দেখা হয়নি। কতো হবে যোগফল ? যোগ করে দেখাই যাক না !'

ছকটা সামনে মেলে ধরে দীপু মনে মনে প্রথম আর শেষ সারি বরাবর যোগ করে দেখল যোগফল হচ্ছে ১৭৫ ; স্তম্ভ বরাবরও তাই। কোণাকুণি যোগফল কতো ? তা-ও ১৭৫।

রাঙাদা বলল, 'অভ্যেস হয়ে গেলে ছকের বাইরে ওপরের দিকে আর ডান দিকে ভাঙ্গা লাইনের খোপের মধ্যেকার সংখ্যাগুলো লিখে

	৩১	৪০	৪৯	২	১১	২০	
৩০	৩৯	৪৮	১	১০	১৯	২৮	৩০
৩৮	৪৭	৭	৯	১৮	২৭	২৯	৩৮
৪৬	৬	৮	১৭	২৬	৩৫	৩৭	৪৬
৫	১৪	১৬	২৫	৩৪	৩৬	৪৫	৫
১৩	১৫	২৪	৩৩	৪২	৪৪	৪	১৩
২১	২৩	৩২	৪১	৪৩	৩	১২	২১
২২	৩১	৪০	৪৯	২	১১	২০	

নেবার আর দরকার হবে না। নিয়মটা মনে থাকলে সংখ্যাগুলো ঠিক ঠিক জায়গায় লিখতে কোনো অসুবিধেই হবে না।'

মজার ত্রিভুজ

চারকোণা ছক তো হলো। এবার তিনকোণা ছকের কথা বলি। রাঙাদা বলল, জানিস, সেদিন হাতে কিছু সময় ছিল তাই ঘুরতে ঘুরতে একটা পার্কে গিয়ে বসলাম। পার্কটা তিনটে রেলিং দিয়ে ঘেরা, মানে তে-কোণা পার্কে বসে আছি, উল্টোদিকের কোণের দিকে চোখ পড়তেই দেখি দুটো পাখি বসে আছে। পার্কে পাখি বসবে তাতে আর অবাক হবার কী আছে। অবাক হতাম না যদি না ডাইনে-বাঁয়ে চোখ পড়ত। উল্টোদিকের কোণ থেকে সরে চোখ

দুটো গিয়ে পড়ল বাঁদিকের কোণে। দেখি ওখানে বসে আছে পাঁচটা পাখি। ঠিক তিনটে বেশি।

'তারপর ? তারপর ?' দীপু আর গৌতম রহস্যজনক কিছুর গন্ধ পেল যেন।

আমার কেমন কৌতূহল হল। ডানদিকের কোণের দিকে তাকালাম। সেখানেও দেখি কয়েকটা পাখি বসে। দেখতে দেখতে সেখানে আরো কয়েকটা পাখি এসে বসল। গুণে দেখি ঠিক আটটা পাখি বসে। সত্যি খুব অবাক হয়ে গেলাম আমি। পাখিগুলো কি নিজেদের মধ্যে কোনো যুক্তি করেছে ? কে জানে ! এক কোণে দুটো আর এক কোণে তার থেকে তিনটে বেশি আর অবশিষ্ট কোণে আরো তিনটে বেশি। বেশ মিল রেখেই বসেছে পাখিগুলো। চট করে এরকম দেখা যায় না।

দীপু টিপ্পনি কাটল, 'পাখিগুলো বোধ হয় অংক-টংকজানে রাঙাদা।

'তোর কাছ থেকেই বোধ হয় শিখেছে,' গৌতম ফোড়ন কাটল।

'—আমার কাছ থেকে না, তোর কাছ থেকেই শিখেছে, তুই পাখি পুষিস কিনা।'

'—আমার পাখিকে তো তুই-ই কথা বলা শেখাস।'

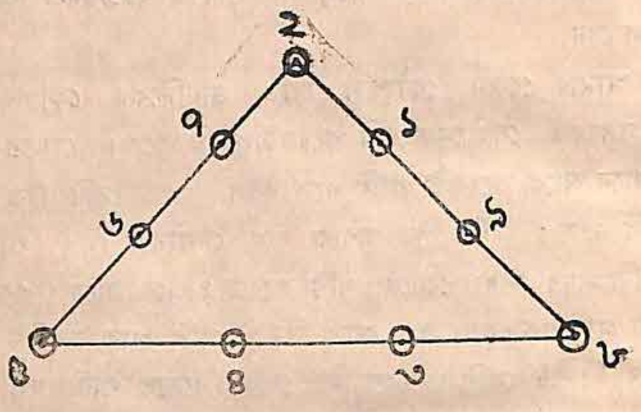
রাঙাদা ওদের থামিয়ে দিয়ে বলে, পাখিদের ঐ ব্যাপার দেখে আমার মাথায় ছোট্ট একটা ম্যাজিকের আইডিয়া এসে গেল। আমি বাড়ি এসেই একটা কাগজ নিয়ে ঐ পার্কের মতো একটা ত্রিভুজ এঁকে ফেললাম। তারপর ত্রিভুজের তিন কোণায় পাখিদের ঐ সংখ্যাগুলো মানে, ২, ৫, ৮ বসিয়ে দিলাম।

তারপর ?

তারপর ১ থেকে ৯ অব্দি বাকি সংখ্যাগুলো (মানে ২, ৫, ৮ বাদে) ত্রিভুজের ধার বরাবর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এমনভাবে বসিয়ে গেলাম যাতে যে কোনো ধার বরাবর সংখ্যাগুলো যোগ করলে ২০ হয়।

রাঙাদা লিখে দেখাল—

কোণাগুলো বাদে প্রত্যেক ধারে দুটো করে সংখ্যা, কোনো সংখ্যাই একবারের বেশি ব্যবহার হয়নি।

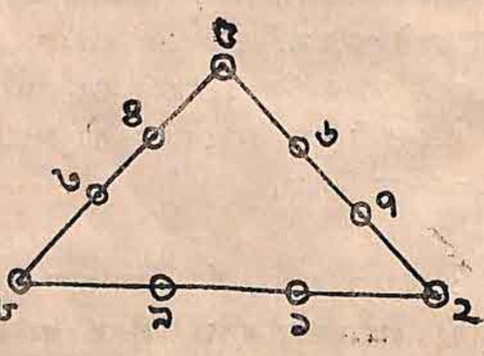


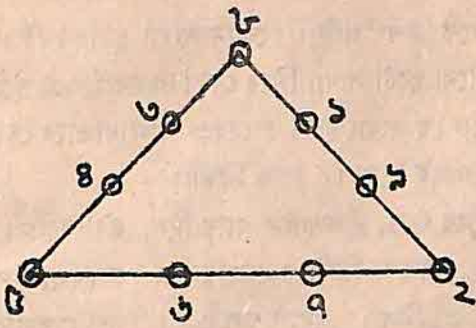
বাঁ ধার বরাবর যোগ : ২+৭+৬+৫=২০

ডান ধার বরাবর যোগ : ২+১+৯+৮=২০

নিচের ধার বরাবর যোগ : ৫+৪+৩+৮=২০

সংখ্যাগুলোর জায়গা অদলবদল করে অন্যভাবেও লেখা যায়।



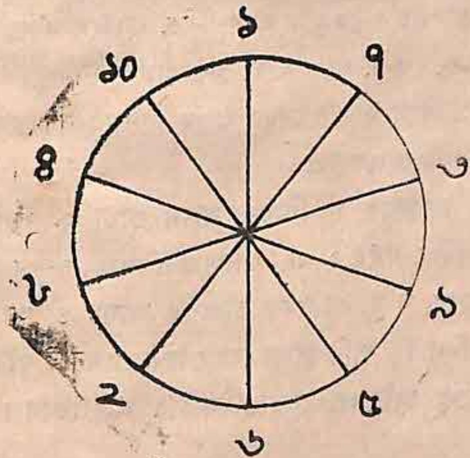


মজার চাকা

দীপু আর গৌতম সেদিন এক মেলা দেখতে গিয়েছিল। এমনি মেলা নয়, বিজ্ঞান মেলা। ইস্কুলের ছেলেদের তৈরী নানা মডেল। ঘুরতে ঘুরতে ওরা দেখে এক জায়গায় বেশ ভিড়। ব্যাপার কী? এত ভিড় কেন?

ওরা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। ভিড় ঠেলে আস্তে আস্তে সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

একটা ছোট্ট ছেলের হাতে কাঠের তৈরী ছোট একটা চাকা। দেখতে ঠিক গোরুর গাড়ির চাকার মতো। চাকার ধার বরাবর ১ থেকে ১০ অব্দি দশটা সংখ্যা লেখা।



ছোট ছেলেটা বলে চলেছে, দেখুন চাকার গায়ে দশটা সংখ্যা

আছে, এক থেকে দশ অব্দি। কোন সংখ্যা দুবার নেই। পাশাপাশি যে কোনো দুটো সংখ্যা নিয়ে যোগ করুন। ঐ দুটো সংখ্যার ঠিক উল্টো দিকে যে সংখ্যা দুটো তাদেরও আলাদাভাবে যোগ করুন। দেখুন যোগফল একই হচ্ছে। হচ্ছে কিনা ?

ভিড়ে দাঁড়িয়ে থাকা দু একজন সায় দিল, হ্যাঁ হচ্ছে।

দীপু আর গৌতম মিলিয়ে দেখছিল। ওরা পাশাপাশি দুটো সংখ্যা ৩ আর ৯ নিল। যোগ ফল ১২। ওরা দেখল ৩-এর ঠিক উল্টোদিকে রয়েছে ৮ আর ৯ এর ঠিক উল্টোদিকে ৪। এই ৮ আর ৪-এর যোগফলও ১২।

পাশাপাশি অন্য দুটো সংখ্যা নেওয়া যাক, ১০ আর ৪। যোগফল ১৪। এদের ঠিক উল্টোদিকে আছে ৫ আর ৯, এদেরও যোগফল ১৪।

ছেলেটার কথা মিলে গেছে।

বাড়ি গিয়েই ওরা রাঙাদাকে বলল ব্যাপারটা।

ওরা কিন্তু ১ থেকে ১০ অব্দি সংখ্যাগুলো কোনটা কোন জায়গায় তা মনে করতে পারল না। রাঙাদাকে তাই ওরা ধরল এমন একটা উপায় বলে দিতে যাতে ঠিক ঠিক মনে থাকে।

রাঙাদা সব শুনেটুনে কাগজে একটা বৃত্ত আঁকলো। গোরুর গাড়ির চাকায় যেমন থাকে তেমনি ওপর-নিচে, ডাইনে বাঁয়ে মিলিয়ে মোট পাঁচটা, ক-ক, খ-খ, গ-গ, ঘ-ঘ, ঙ-ঙ লাইন টানল্। তারপর একেবারে ওপরে ১ লিখে ছবিতে যেমন আছে ঐভাবে পরপর ২, ৩, ৪ ইত্যাদি সংখ্যাগুলো লিখে ফেলল।

তারপর খ খ লাইনের দু দিকের সংখ্যা দুটো ২ আর ৭-এর জায়গা বদল করে দিল, মানে ২-এর জায়গায় ৭ আর ৭-এর জায়গায় ২ লিখল। এভাবে ঘ-ঘ লাইনের দুদিকের সংখ্যা ৪ আর ৯-এর জায়গা বদল করে দিল। বাকিগুলো যেমন ছিল তেমন ই রইল।

তার মানে শুধু দুটো লাইনের দুদিককার সংখ্যাগুলোর জায়গা বদল হলো।